মৃণালিনীর ভাই উপেন্দ্র, যে তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিল, তাহার নিকট সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দিতে বাধ্য হইল। সমস্যা হইয়া উঠিল আরো গুরুতর। পারিবারিক বন্ধু প্রবীণ চিকিৎসক কিন্তু পূর্ব্বমতই বাহাল রাখিলেন, উপরন্তু জানাইলেন, মৃণালিনী সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিলেও তাহার সুধাংশুর নিকট থাকা উচিত নহে, যেহেতু স্ত্রীর সন্তানের ঐ ভীষণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবার ষোলআনা সম্ভাবনা। উপেন্দ্রের পরামর্শে মৃণালিনী চলিয়া যাইতে রাজী হইল। লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যায়, মৃণালিনীর ট্রেণের বহুপূর্ব্বেই সুধাংশুকে চন্দন-চর্চ্চিত হইয়া বর সাজিয়া বিবাহ-বাসরাভিমুখে যাইতে হইবে। মৃণালিনীও যাইবার পূর্ব্বে তাহাকে প্রণাম করিতে আসিল, আর যবনিকা পতন হয় মৃণালিনীর শেষ প্রশ্নের স্বর নীরব হইবার পূর্ব্বেই—"ওগো সত্যিই কি আমার আর কোন আশা নেই ?"

সংক্ষিপ্তসার দিয়া প্রবোধকুমারের নাট্যরচনার কৃতিত্ব পূর্ণ প্রকটিত করা অসম্ভব। একটু একটু করিয়া টিপিয়া টিপিয়া অথচ অনাবশ্যক ঘোরাঘুরি না করিয়া পাঠকের মনকে গল্পের দিকে টানিয়া লইবার অসাধারণ ক্ষমতা প্রবোধকুমার দেখাইয়াছেন। আর দেখাইয়াছেন নাটকে করুণ দৃশ্য ফুটাইতে হইলে নাট্যকারকে কিরূপ নিষ্করুণ হইতে হয়। তাঁহার প্রত্যেকটি চরিত্র স্বধর্ম্মের অখণ্ড প্রকাশে ভাস্বর। ঘটনা-গ্রন্থনেও মালতী ও উপেন্দ্রের ব্যবহারে যে দুএকটি ত্রুটি আমাদের চোখে পড়িয়াছে তাহা লইয়া মতভেদ সম্ভব ও তাহারা এত:সামান্য যে ধর্ত্তব্যই নহে। এ সত্ত্বেও প্রবোধকুমারের নাট্যকার-বৃত্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ দেখার পূর্ব্বে। 'শুভযাত্রা'র প্রধান আকর্ষণ তাহার চরিত্র চিত্রণে ততটা নয়, যতটা সুনিপুণ বিষয় নির্ব্বাচন। প্রবোধকুমারের আখ্যানবস্তু অস্বাভাবিক নহিলেও অতি-বিরল। তাহাতে বোঝা যায়, ট্র্যাজেডির রহস্যকে তিনি এখনও পাশ হইতে আক্রমণ করিতেছেন, মুখোমুখি নহে। তাঁহার দৃষ্টি-ক্ষেত্রের পরিধি সংকীর্ণ। জগতের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিগুলিতে অতি-বিরল ঘটনার অবতারণা হয় নাই, এমন নহে; কিন্তু তাহারা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে ঘটনা-সংস্থানের উপর নির্ভর করিয়া নয়, বিরাট চরিত্রসৃষ্টির বিপুল কবিত্বশক্তির প্রসাদে।

বাংলাসাহিত্যে গীতিকবিতার উৎকর্ষ যেরূপ প্রখর, নাটকের অপকর্ষ তেমনই নিষ্প্রভ। মনে হয় নাকি একের উৎকর্ষই অপরের অপকর্ষের অন্যতম কারণ? কারণ, গীতিকবিতায় যেগুণ অবশ্য প্রয়োজনীয়, অনেক সময়ে তাহা নাটকীয় সৌন্দর্য্যের পরিপন্থী। বাঙালী চরিত্রে গীতিকবিতাসুলভ স্বশীল আবেগের প্রাচুর্য্য সকলেরই চোখে পড়ে; নাই আমাদের সেই স্বানুরাগহীন নির্ম্মায়িকতা যাহা শ্রেষ্ঠ নাটকের ঐশ্বর্য্য। রবীন্দ্র মৈত্র ও প্রবোধকুমারের রচনায় এই নির্ম্মায়িকতার দর্শন মেলে। রবীন্দ্র মৈত্রের লেখনী অকালে থামিয়া গেল। প্রবোধকুমারের উপর এখন বাংলা নাট্যসাহিত্যের দাবী অনেক। শুধু এইটুকু প্রার্থনা, 'জার্ণিজ্ এণ্ড'-এর পর "ব্যাজার্স গ্রীণ" পড়িবার দুর্ভাগ্য হইতে বাঙালী পাঠক যেন অব্যাহতি পায়।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

প্রকাশক—শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী, ১৩৯-এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
রামকুমার মেশিন প্রেস, ১৬৩, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পরিচয়

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বার্ষিক ৪।০

প্রতি সংখ্যা ১৲

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
কার্ত্তিক, ১৩৪০

বিষয় সূচী

প[illegible]ক-পরিচয়

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল, শ্রীশোভা সরকার, শ্রীছায়া দেবী, শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য, শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য, শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীগঙ্গাচরণ কর, শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীস্বর্ণপ্রভা সেন, শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার ইত্যাদি।

৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা
কার্ত্তিক, ১৩৪০

পরিচয়

নয় মাত্রার ছন্দ

গত ১৩৩৯ সালের আষাঢ় মাসের 'বিচিত্রা'য় নয় মাত্রার ছন্দ-সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলাম। বাংলা ভাষায় নয় মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহার দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বাংলায় চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, দশ মাত্রার পর্ব্ব লইয়া ছন্দোবন্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু নয় মাত্রার পর্ব্ব অবলম্বন করিয়া কবিতা রচনা হইতে পারে কিনা—সে বিষয়ে পথনির্দ্দেশ করিবার জন্য ছন্দশিল্পীদের আহ্বান করিয়াছিলাম। এতৎসম্পর্কে মাত্র দুইটি লেখা তাহার পরে পড়িয়াছি। একটির লেখক—শ্রাবণ ১৩৩৯ সংখ্যার 'বিচিত্রা'য় শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক। অপরটির লেখক—কার্ত্তিক ১৩৩৯ সংখ্যার 'পরিচয়ে' কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম প্রবন্ধে প্রকাশিত উদাহরণের আলোচনা পরে করিব, প্রথমে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তগুলির কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিতে চাই।

রবীন্দ্রনাথের মত—বাংলায় নয় মাত্রার ছন্দ খুব চলে এবং আরও চলিতে পারে। তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত লেখা হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এবং কয়েকটি নূতন দৃষ্টান্তও রচনা করিয়াছেন। বাংলা ছন্দে কি চলে আর না চলে এ সম্বন্ধে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মত অতুলনীয় ছন্দশিল্পীর মতই প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধটি পড়িয়া মনে হইল তিনি ঠিক আমার প্রশ্নটির উত্তর দিবার চেষ্টা করেন নাই। নয় মাত্রার **চরণ** লইয়া যে ছন্দোবন্ধ হয়, তিনি তাহারই উদাহরণ দিয়াছেন, কিন্তু নয় মাত্রার **পর্ব্ব** লইয়া ছন্দোবন্ধ হয় কিনা তাহা বুঝাইবার বা

দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি যে পর্ব্বের কথা চিন্তা না করিয়া চরণের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন তাহা ঐ প্রবন্ধের শেষ অংশ হইতেই বেশ বোঝা যায়। তিনি নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত দেওয়ার পর, এগার, তের, পনের, সতের, উনিশ, একুশ মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে "বাংলায় নতুন ছন্দ তৈরী করতে অসাধারণ নৈপুণ্যের দরকার করে না।" এগার হইতে একুশ মাত্রার ছন্দের যে দৃষ্টান্তগুলি দিয়াছেন তাহাতে যে চরণের মোট মাত্রা সংখ্যা লইয়াই গণনা করা হইয়াছে, চরণের উপকরণ পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা লইয়া গণনা করা হয় নাই তাহা ত সুস্পষ্ট। একটু বিশ্লেষণ করা যাক্।

এগার মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্তগুলির ছন্দোলিপি করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

১। চামেলির : ঘন-ছায়া-	বিতানে	=(৪+৪)+৩
বনবীণা : বেজে ওঠে	কী তানে।	=(৪+৪)+৩
স্বপনে : মগন : সেথা	মালিনী	=(৩+৩+২)+৩
কুসুম- : মালায় : গাঁথা	শিথানে॥	=(৩+৩+২)+৩

এখানে ছন্দের উপকরণ আট মাত্রার পর্ব্ব। প্রতি চরণে একটি আট মাত্রার পর্ব্ব ও পরে একটি তিন মাত্রার অপূর্ণ (catalectic) পর্ব্ব আছে। হয়ত কেহ অন্যভাবেও ইহার ছন্দোলিপি করিতে পারেন—

চামেলির : ঘন-	ছায়া- : বিতানে	=(৪+২)+(২+৩)
বন বীণা : বেজে	ওঠে : কী তানে।	=(৪+২)+(২+৩)
স্বপনে : মগন	সেথা : মালিনী	=(৩+৩)+(২+৩)
কুসুম : মালায়	গাঁথা : শিথানে॥	=(৩+৩)+(২+৩)

এ রকম ছন্দোলিপি করিলে মূল পর্ব্বটি হয় ছয় মাত্রার, এবং চরণটি একটি ছয় মাত্রার পূর্ণ ও একটি পাঁচ মাত্রার অপূর্ণ পর্ব্বের সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়।

এ রকমের ছন্দোবন্ধ অবশ্য রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বেও করিয়াছেন। যেমন—

—তাহারে শুধায় হেসে	যেমনি	=(৩+৩+২)+৩
—নতমুখে চলি গেলা	তরুণী	=(৪+৪)+৩
—এ ঘাটে বাঁধিব মোর	তরণী	=(৩+৩+২)+৩

এ রকম প্রত্যেক চরণের সঙ্কেত ৮+৩।

৬+৫ সঙ্কেতের উদাহরণও পাওয়া যায়—

—শিলা রাশি রাশি	পড়িছে খসে	=(২+৪)+(৩+২)
—গরজি উঠিছে	দারুণ রোষে	=(৩+৩)+(৩+২)

প্রাচীন কবিদের একাবলী আসলে এই সঙ্কেতের ছন্দ।

২। মিলন-মুলগনে	কেন বল্	=(৩+৪)+৪
নয়ন করে তোর	ছল্ ছল্!	=(৩+৪)+৪
বিদায়-দিনে যবে	ফাটে বুক,	=(৩+৪)+৪
সে দিনো দেখেছি তো	হাসিমুখ॥	=(৩+৪)+৪

এখানে মূল পর্ব্ব সাত মাত্রার। এ সঙ্কেতের উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের আগেকার কাব্যেও পাওয়া যায়—

তাহাতে এ জগতে	ক্ষতি কার,
নামাতে পারি যদি	মনোভার?
দু' কথা বলি যদি	কাছে তার
তাহাতে আসে যাবে	কী বা কার?

তের মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত কাব্য হইতেই দিয়াছেন—

(৩) গগনে গরজে মেঘ,	ঘন বরষা	=৮+৫
কূলে একা বসে আছি,	নাহি ভরসা	=৮+৫

আরও দেওয়া যায়, যেমন—

রঙীন খেলেনা দিলে	ও[illegible] হাতে	=৮+৫
তখন বুঝিরে, বাছা,	কেন যে প্রাতে	=৮+৫

এই দুই উদাহরণেই মূল পর্ব্ব আট মাত্রার।

পনের মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

(৪) হে বীর জীবন দিয়ে	মরণেরে জিনিলে	=(৩+৩+২)+(৪+৩)
নিজেরে নিঃস্ব করি	বিশ্বেরে কিনিলে	=(৩+৩+২)+(৪+৩)

এখানে মূল পর্ব্ব আট মাত্রার। পূর্ব্বপ্রকাশিত কাব্যেও এ রকম পাওয়া যায়, যেমন—

দিন শেষ হয়ে এল | আঁধারিল ধরণী=৮+৭

সতের মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণ দিয়াছেন সেখানে মুদ্রিত দুইটি পংক্তি যোগ করিয়া তবে সতেরটি মাত্রা পাওয়া যায়। স্নুতরাং সেখানে যে সতের মাত্রার পর্ব্ব নাই তাহা বলাই বাহুল্য।

(৫) ভরা নদী, দুই কূলে কূলে
কাশবন দুলিছে।
পূর্ণিমা তারি ফুলে ফুলে
আপনারে ভুলিছে।

এখানে পংক্তিগুলিতে যথাক্রমে ১০, ৭, ১০, ৭ মাত্রা করিয়া আছে। এক একটি পংক্তির শেষে যে সুস্পষ্ট যতি আছে তাহা লিখিবার ভঙ্গী হইতেই ধরা পড়ে। প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির শেষে যে যতি আছে তাহা অর্দ্ধযতি কি পূর্ণযতি তাহা লইয়া কিছু মতভেদ হইতে পারে। যদি তাহাকে অর্দ্ধযতি বলিয়াও ধরা যায় তাহা হইলেও সেখানে একটি পর্ব্বের শেষ হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়, স্নুতরাং দশ মাত্রার চেয়ে বড় পর্ব্ব এখানে পাওয়া যায় না। আমার নিজের মনে হয় যে এখানে দশ মাত্রার পর্ব্বও নাই, দশ মাত্রার পর্ব্ব থাকিলে কাব্যের যে গাম্ভীর্য্য থাকে তাহার নিতান্ত অভাব এখানে পরিলক্ষিত হয়। প্রতি পংক্তির শেষে পূর্ণ যতি আছে বলিয়া মনে হয়, স্নুতরাং এক একটি পংক্তিকেই আমি এক একটি চরণ বলিয়া ধরিতে চাই। প্রতি চরণে দুই পর্ব্ব, এবং মূল পর্ব্ব প্রথম ও তৃতীয় চরণে ছয় মাত্রার, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থে চার মাত্রার। মূল পর্ব্ব সর্ব্বত্রই ছয় মাত্রার অথবা সর্ব্বত্রই চার মাত্রার এইরূপ ধরিয়া পাঠ ও ছন্দোলিপি করাও চলিতে পারে।

উনিশ মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণ দিয়াছেন সেখানেও দুইটি পংক্তি যোগ না করিলে উনিশ মাত্রা পাওয়া যায় না। অথচ এক একটি পংক্তি আসলে এক একটি চরণ; পর্ব্ব নহে, পর্ব্বাঙ্গ ত নহেই।

(৬) ঘন মেঘভার | গগন তলে =৬+৫
বনে বনে ছায়া | তারি, =৬+২
একাকিনী বসি | নয়ন-জলে =৬+৫
কোন্ বিরহিনী | নারী। =৬+২

এখানে ছয় মাত্রার পর্ব্ব অবলম্বন করিয়া ছন্দ রচনা করা হইয়াছে। প্রতি চরণে দুইটি পর্ব্ব, প্রথমটি পূর্ণ ও অপরটি অপূর্ণ। প্রথম ও তৃতীয় চরণে অপূর্ণ পর্ব্বটি পাঁচ মাত্রার এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে দুই মাত্রার।

একুশ মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণ দিয়াছেন, সেখানেও ঐ ঐ মন্তব্য খাটে। দুইটি পংক্তি বা দুইটি চরণ যোগ না করিলে একুশ মাত্রা পাওয়া যায় না, ছন্দের মূল উপকরণ যে পর্ব্ব তাহাতে মাত্র ছয়টি করিয়া মাত্রা পাওয়া যাইতেছে।

(৭) বিচলিত কেন | মাধবী শাখা =৬+৫
মঞ্জরী কাঁপে | থর থর, =৬+৪
কোন্ কথা তার | পাতায় ঢাকা =৬+৫
চুপি চুপি করে | মরমর =৬+৪

ঐ দৃষ্টান্তগুলির বিশ্লেষণ হইতে বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ পর্ব্বের মাত্রার কথা ঐ প্রবন্ধে আলোচনা করেন নাই, তিনি চরণের মাত্রা, কখন কখন চরণের অপেক্ষাও বৃহত্তর ছন্দোবিভাগ অর্থাৎ শ্লোকার্দ্ধের মাত্রার সংখ্যার হিসাব করিয়াছেন। কাজেই নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে যে উদাহরণগুলি দিয়াছেন তাহাতেও যে নয় মাত্রার চরণই পাওয়া যায়, নয় মাত্রার পর্ব্ব পাওয়া যায় না, তাহা বিচিত্র নহে। দশ মাত্রার পর্ব্বই বোধ হয় বাংলা ছন্দের বৃহত্তম পর্ব্ব, এতদপেক্ষা বৃহত্তর পর্ব্বের ভার সহ্য করা বাঙালীর ছন্দে বোধহয় সম্ভব নহে। সতের, উনিশ, একুশ ইত্যাদি মাত্রা সংখ্যা লইয়া বাংলা ছন্দের পর্ব্ব গঠন করা অসম্ভব।

পর্ব্ব লইয়া এত আলোচনা করিতেছি কারণ পর্ব্বই বাংলা ছন্দের উপকরণ। পর্ব্বের সহিত পর্ব্ব গ্রথিত করিয়াই ছন্দের মাল্য রচনা করা হয়; পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা হইতেই ছন্দের চাল বোঝা যায়; মিতাক্ষর ছন্দে পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা পরিমিত বলিয়াই তাহা মিতাক্ষর। পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা ঠিক রাখিয়া নানাভাবে চরণ ও স্তবক গঠন করিলেও ছন্দের ঐক্য বজায় থাকে, কিন্তু যদি পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যার হিসাবে গরমিল হয়, তবে চরণের মাত্রা বা স্তবক গঠনের রীতি দ্বারা ছন্দের ঐক্য বজায় রাখা যাইবে না। দু' একটি উদাহরণের দ্বারা আমার বক্তব্যটি পরিস্ফুট করিতেছি।

তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি—

এই চরণটিতে মোট সতের মাত্রা।

সকাল বেলা কাটিয়া গেল বিকাল নাহি যায়—

এই চরণটিতেও মোট সতের মাত্রা। কিন্তু এই দুইটি চরণে মোট মাত্রাসংখ্যা সমান বলিয়া তাহাদের সতের মাত্রার ছন্দ নাম দিয়া এক গোত্রে ফেলা কি সম্ভব হইবে? এই দুইটি চরণ কি কখন একই স্তবকে গ্রথিত হইতে পারে? ইহার উত্তর—না। কারণ, এই দুইটি চরণের চাল ভিন্ন, তাহাদের প্রকৃতি ভিন্ন। এই পার্থক্যের স্বরূপ বোঝা যায় চরণের উপকরণ স্থানীয় পর্ব্বের মাত্রা হইতে। প্রথম চরণটিতে মূল পর্ব্ব ছয় মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ—

তুমি আছ মোর | জীবন মরণ | হরণ করি। =(৬+৬+৫)

দ্বিতীয় চরণটি মূল পর্ব্ব পাঁচ মাত্রার, তাহার ছন্দোলিপি এইরূপ—

সকাল বেলা | কাটিয়া গেল | বিকাল নাহি | যায়=(৫+৫+৫+২)

ছয় মাত্রার ও পাঁচ মাত্রার পর্ব্বের ছন্দোগুণ সম্পূর্ণ পৃথক। এই পার্থক্যের জন্যই উদ্ধৃত চরণ দুইটির ছন্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া মনে হয়। কাজেই ছন্দের পরিচয় দিতে গেলে বা তাহার শ্রেণীবিভাগ করিতে গেলে পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যার অনুযায়ী করাই সঙ্গত, চরণের মাত্রাসংখ্যার অনুসারে করিলে কোন লাভ নাই।

আর একটি উদাহরণ দিই।

হেরিনু রাতে, উতল উৎসবে
তরল কলরবে
আলোর নাচ নাচায় চাঁদ সাগরজলে যবে,
নীরব তব নম্র নত মুখে
আমারি আঁকা পত্রলেখা, আমারি মালা বুকে।
দেখিনু চুপে চুপে
আমারি বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিত-গীত-কলিত-কল্লোলে॥

উদ্ধৃত স্তবকের ভিন্ন ভিন্ন চরণে যথাক্রমে ১২, ৭, ১৭, ১২, ১৭, ৭, ১৭, ১২, ১২ মাত্রা আছে। এক একটি চরণের মোট মাত্রাসংখ্যা হইতে

অথবা নির্দ্দিষ্ট মাত্রার চরণ-সন্নিবেশের রীতি হইতে এখানে স্তবকের ঐক্য-সূত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু বরাবর পাঁচ মাত্রার মূলপর্ব্ব ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই এখানে ছন্দের ঐক্য বজায় আছে। ইহা হইতেও বোঝা যায় যে ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায় পর্ব্বের মাত্রাসংখ্যা হইতে, চরণের মাত্রাসংখ্যা হইতে নহে।

এই উপলক্ষে পর্ব্ব সম্বন্ধে দু' একটি কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে চাই। প্রত্যেক পর্ব্বের পরে একটি অর্দ্ধযতি থাকে, অর্থাৎ সেই সময়ে জিহ্বার একবারের ঝোঁক শেষ হয় এবং পুনশ্চ শক্তি সংগ্রহের জন্য অতি সামান্য ক্ষণের জন্য জিহ্বার ক্রিয়া বিরত থাকে। জিহ্বার এক এক বারের ঝোঁকে ক্লান্তিবোধ বা বিরামের আবশ্যকতার বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত যতটা উচ্চারণ করা যায়, তাহারই নাম পর্ব্ব।

এক একটি পর্ব্ব দুইটি বা তিনটি পর্ব্বাঙ্গের সমষ্টি। অন্ততঃ দুইটি পর্ব্বাঙ্গ না থাকিলে পর্ব্বের মধ্যে ছন্দের গতি বা তরঙ্গ অনুভূত হয় না। তিনটির বেশী পর্ব্বাঙ্গ দিয়াও পর্ব্ব গঠিত হয় না, করিতে গেলে তাহা বাংলা ছন্দের গতির ব্যভিচারী হইবে। এক একটি পর্ব্বাঙ্গে এক হইতে চার পর্য্যন্ত মাত্রা থাকিতে পারে। এক একটি পর্ব্বাঙ্গ সাধারণতঃ একটি গোটা মূল শব্দ অথবা একাধিক গোটা মূল শব্দের সহিত সমান। পর্ব্বাঙ্গ স্বর-গাম্ভীর্য্যের উত্থান পতনের এক [illegible]ঙ্গের অনুসরণ করে।

পর্ব্ব ও চরণের মধ্যে পার্থক্য এই যে সাধারণতঃ চরণ মাত্রেই একাধিক পর্ব্বের সমষ্টি। পর্ব্বের পর অর্দ্ধযতি আর চরণের পর পূর্ণযতি থাকে।

এইবার নয় মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত বলিয়া কবিগুরু যে উদাহরণগুলি দিয়াছেন সেইগুলির বিশ্লেষণ করা যাক্।

(ক)

আঁধার রজনী পোহাল,
জগৎ পূরিল পুলকে,
বিমল প্রভাত কিরণে
মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে।

এখানে প্রত্যেক পংক্তিতে নয় মাত্রা আছে। কিন্তু এক একটি পংক্তি কি এক একটি পর্ব্ব না চরণ? পংক্তির শেষে যে যতি আছে তাহা অর্দ্ধযতি

না পূর্ণযতি ? জিহ্বার ঝোঁক কি পংক্তির শেষে আসিয়া শেষ হইতেছে না পূর্ব্বেই কোন স্থলে শেষ হইয়া আবার নূতন ঝোঁকের আরম্ভ হইতেছে। ইহার ছন্দোলিপি কিরূপ হইবে—

অঁাধার : রজনী : পোহাল।
জগৎ : পূরিল : পুলকে |
বিমল : প্রভাত : কিরণে |
মিলিল : দ্যুলোক : ভূলোকে |

এইরূপ, না

অঁাধার : রজনী | পোহাল,	=(৩+৩)+৩
জগৎ : পূরিল | পুলকে,	=(৩+৩)+৩
বিমল : প্রভাত | কিরণে	=(৩+৩)+৩
মিলিল : দ্যুলোক | ভূলোকে,	=(৩+৩)+৩

এইরূপ ?

আমার মনে হয় উদ্ধৃত শ্লোকটিতে ছয় মাত্রার পর্ব্বই মূলপর্ব্ব, এবং দ্বিতীয় প্রকারে ছন্দোলিপি করাই স্বাভাবিক। কয়েকটি যুক্তি ও এ সম্পর্কে উত্থাপন করিতেছি।

"অঁাধার" ও "রজনী" এই দুটি শব্দের উচ্চারণকালে তন্মধ্যে ধ্বনির যে প্রবাহ, "রজনী"র পর "পোহাল" উচ্চারণ করিতে গেলে তন্মধ্যেও কি ধ্বনির সেই প্রবাহ ? "অঁাধার" ও "রজনী"র মধ্যে যতি নাই, কিন্তু "রজনী"র পরে কি একটি হ্রস্ব যতি বা অর্দ্ধ যতি আসে না ? যদি আসে তবে ঐখানেই পর্ব্বের শেষ ও নূতন একটি পর্ব্বের আরম্ভ।

"পোহাল" শব্দটির পর একটি কমা আছে এবং ঐখানেই একটি বাক্যের শেষ হইয়াছে। সুতরাং ঐখানে একটি পূর্ণযতি আসাই কি একান্ত স্বাভাবিক নহে ? যদি ঐখানে পূর্ণযতি আসে, তবে ঐখানে একটি চরণের শেষ হইয়াছে। জটিল স্তবকের মধ্যে যেখানে elliptical বা অপূর্ণ চরণের ব্যবহার হয় সেখানে ভিন্ন অন্যত্র একটিমাত্র পর্ব্বে চরণ গঠিত হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে হ্রস্ব যতি বা অর্দ্ধযতি মোটে আসিল না, একেবারেই পূর্ণযতি আসিয়া পড়িল—এই ভাবে উচ্চারণ হয় না। সুতরাং "পোহাল" শব্দের পর যদি পূর্ণ যতি থাকে তবে তাহার পূর্ব্বে কোথাও হ্রস্ব যতি নিশ্চয়ই আছে এবং সেইখানে পর্ব্বের শেষ হইয়াছে।

পরে দুইটি উদাহরণ সম্বন্ধেও একথা খাটে। সে দুটিও ছয় মাত্রার পর্ব্বে রচিত।

(খ)	গোড়াতেই : ঢাক | বাজনা	=(৪+২)+৩
	কাজ করা : তার | কাজ না	=(৪+২)+৩
(গ)	শকতি : হীনের | দাপনি	=(৩+৩)+৩
	আপনারে : মারে | আপনি	=(৪+২)+৩

ছয় মাত্রার পর্ব্বের ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের কাব্যে খুব বেশী, এ বিষয়ে তাঁহার প্রবণতা স্বাভাবিক।

(৩+৩+৩) এই সঙ্কেতে নয় মাত্রার ছন্দ রচনা করিতে গেলে সাধারণতঃ তাহা (৩+৩)+৩ হইয়া দাঁড়ায় ; অর্থাৎ যাহা নয় মাত্রার পর্ব্ব বলিতে চাই তাহা ছয় মাত্রার একটি মূল পর্ব্ব এবং তিন মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব্বের সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়। শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিকও তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

এই উদাহরণগুলিতে যে নয়মাত্রার পর্ব্ব নাই তাহার একটি crucial test বা চূড়ান্ত প্রমাণ পরে দিব। আপাততঃ অন্য দৃষ্টান্তগুলি আলোচনা করা যাক।

(ঘ) আসন দিলে অনাহূতে
ভাষণ দিলে বীণা তানে,
বুঝি গো তুমি মেঘদূতে
পাঠায়েছিলে মোর পানে।

এখানে মূলপর্ব্ব নয় মাত্রার নয়, যদিও প্রতি পংক্তিতে নয়টি মাত্রা আছে। মূল পর্ব্ব পাঁচ মাত্রার, প্রত্যেকটি পংক্তি একটি চরণ, প্রতি চরণে দুইটি পর্ব্ব, একটি পাঁচমাত্রার পূর্ণ পর্ব্ব, অপরটি চার মাত্রার অপূর্ণ পর্ব্ব। ছন্দোলিপি করিলে এইরূপ হইবে—

আসন : দিলে | অনা : হূতে	=(৩+২)+(২+২)
ভাষণ : দিলে | বীণা : তানে,	=(৩+২)+(২+২)
বুঝি গো : তুমি—মেঘ : দূতে	=(৩+২)+(২+২)
পাঠায়ে : ছিলে | মোর : পানে	=(৩+২)+(২+২)

এখানে (৩+২+৪) সঙ্কেতের পর্ব্ব নাই, (৩+২)+(২+২) সঙ্কেতের চরণ আছে। "আসন" ও "দিলে" এই দুই শব্দের মাঝে যেরূপ ধ্বনির

প্রবাহ, "দিলে" ও "অনাহূতের" মধ্যে সেরূপ নয়। "দিলে" শব্দটির পর একটি যতি অবশ্যম্ভাবী, সেখানে একটি পর্ব্বের শেষ ধরিতেই হইবে।

এতদ্ভিন্ন (৩+২+৪) এই সঙ্কেতে পর্ব্ব রচিত হইতে পারে কি না সে সম্বন্ধে কয়েকটি a priori আপত্তিও আছে। প্রবন্ধ-শেষে সেইগুলি আলোচনা করিব।

(ঙ) বলেছিনু বসিতে কাছে,
দেবে কিছু ছিল না আশা।
দেবো বলে যে জন যাচে
বুঝিলে না তাহারো ভাষা।

এখানেও এক একটি পংক্তি এক একটি চরণ। প্রতি চরণে দুইটি পর্ব্ব, প্রথমটি চার মাত্রার, দ্বিতীয়টি পাঁচ মাত্রার। সঙ্কেত (২+২)+(৩+২); প্রথম চার মাত্রার পর একটি অর্দ্ধ যতির লক্ষণ সুস্পষ্ট।

একটু চেষ্টা করিয়া বরং এখানে এক ঝোঁকে সাত মাত্রা পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিয়া প্রতি পংক্তিতে ৭ মাত্রার একটি পূর্ণ ও ২ মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব্ব রাখা যায়, কিন্তু সমস্ত পংক্তিটিকে এক পর্ব্ব ধরিয়া পাঠ অস্বাভাবিক হইবে।

(চ) বিজুলী কোথা হ'তে এলে
তোমারে কে রাখিবে বেঁধে।
মেঘের বুক চিরি গেলে
অভাগা মরে কেঁদে কেঁদে।

(ছ) মোর বনে ওগো গরবী
এলে যদি পথ ভুলিয়া।
তবে মোর রাঙা করবী
নিজ হাতে নিয়ো তুলিয়া।

এই দুই উদাহরণেই মূল পর্ব্ব ছয় মাত্রার। (চ) উদাহরণে প্রতি পংক্তিতে তিন মাত্রার পর এবং (ছ) উদাহরণে প্রতি পংক্তিতে ছয় মাত্রার পর অনেকটা বেশী ফাঁক ইচ্ছা পূর্ব্বক রাখিয়া লেখা হইয়াছে। সুতরাং ঐ ঐ স্থলে যে নূতন করিয়া ঝোঁক আরম্ভ হইয়াছে এবং একটি পর্ব্ব শেষ করিয়া আর একটি পর্ব্ব আরম্ভ হইয়াছে তাহা সহজেই বোঝা যায়। অধিক বিশ্লেষণ অনাবশ্যক।

স্মরণ রাখা উচিত যে বাংলায় ছয় মাত্রার পর্ব্ব আছে, পর্ব্বাঙ্গ নাই। চার মাত্রার চেয়ে বড় পর্ব্বাঙ্গ বাংলায় অচল।

(জ) বারে বারে যায় চলিয়া
ভাসায় নয়ন-নীরে সে,
বিরহের ছলে ছলিয়া
মিলনের লাগি ফিরে সে।

রবীন্দ্রনাথ ইহাকে ৪+৪+১—এই ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পড়িতে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়া না দিলে অনেকেই বোধ হয় ইহাকে ৬+৩ এই ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া ছয় মাত্রার ছন্দ মনে করিয়া পাঠ করিতেন। নহিলে যে ভাবে শব্দকে ভাঙিয়া পড়িতে হয়, তাহাতে একটু অস্বাভাবিকতা আসে।

ভাসায় ন | য়ন নীরে | সে

অথবা

যাবার বে | লায়, দুয়া | রে—

এইভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পাঠ করিলে একটু কৃত্রিমতার অভিযোগ যথার্থই আসিতে পারে। ছোট এক, দুই বা তিন মাত্রার শব্দকে ভাঙিয়া পর্ব্ব অথবা পর্ব্বাঙ্গ গঠন এক স্বরাঘাত প্রধান (বা ছড়া-র) ছন্দে চলে। অন্যত্র কেবল অপূর্ণ অন্তিম পর্ব্ব গঠনের সময়ই ইহা চলিতে পারে। উপরের উদাহরণে যে শেষ অক্ষরটিকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে তাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু 'নয়ন' ও 'বেলায়' এই দুইটি শব্দকে যে ভাবে ভাঙা হইয়াছে তাহাতে একটু কৃত্রিমতা ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ঐ সূত্রেই স্বীকার করিয়াছেন যে "চরণের শেষে যেখানে দীর্ঘ যতি সেখানে একটিমাত্র ধ্বনিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে সেই যতির মধ্যে তাকে আসন দেওয়া যায়"; * কিন্তু অন্যত্র তাহা চলে না।

যাহা হউক, চার চার মাত্রা করিয়াও যদি ভাগ করা যায়, তবে এক একটি বিভাগ যে পর্ব্ব ও সমগ্র পংক্তিটি যে চরণ তাহাতে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিতেছেন যে "**চরণের** শেষে **দীর্ঘ** যতি" আছে বলিয়া পংক্তির শেষের "ধ্বনি"কে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হইতেছে। সুতরাং এখানে

* মৎপ্রণীত "বাংলা ছন্দের মূলসূত্রে"র ২২ (ক) সূত্রে এই কথাই বলা হইয়াছে।

যে চার মাত্রার পর্ব্ব ও নয় মাত্রার চরণ আছে তৎসম্বন্ধে কোন আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

(ঝ) আলো এল যে দ্বারে তব
ওগো মাধবী বনছায়া।
দোঁহে মিলিয়া নব নব
তৃণে বিছায়ে গাঁথো মায়া ॥

এখানেও প্রতি পংক্তি এক একটি চরণ, পর্ব্ব নহে। লিখিবার কায়দা হইতেই বোঝা যায় যে প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির দুই মাত্রাকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে এবং তদনুসরণে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির প্রথম দুই মাত্রাকেও বিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে। সুতরাং বড় জোর এখানে সাত মাত্রার পর্ব্ব পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে ছন্দোলিপির সঙ্কেত হইবে ২+(৩+৪), (২+৩+৪) নহে। নতুবা (২+৩)+(২+২) এই সঙ্কেতে মূল পর্ব্ব পাঁচ মাত্রার ধরিয়া পাঠ করাও বেশ চলিতে পারে। সমগ্র পংক্তিটি একটি পর্ব্ব এবং ইহার মধ্যে অর্দ্ধ যতিরও স্থান নাই—এরূপ ধারণা কেন অসঙ্গত তাহা পরে বলিতেছি।

(ঞ) সেতারের তারে ধানশী
মীড়ে মীড়ে উঠে বাজিয়া।
গোধূলির রাগে মানসী
সুরে যেন এলো সাজিয়া ॥

এখানে মূল পর্ব্ব ছয় মাত্রার। প্রতি পংক্তিতে দুইটি পর্ব্ব; প্রথমটি ছয় মাত্রার, দ্বিতীয়টি তিন মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব্ব। (ছ) উদাহরণের সহিত ইহার ছন্দোগত কোন প্রভেদ নাই। 'নিজ হাতে নিয়ো তুলিয়া' ও 'সুরে যেন এলো সাজিয়া' ইহাদের ছন্দোলক্ষণ ও ধ্বনিপ্রবাহ একই।

(ট) জলে ভরা নয়ন-পাতে
বাজিতেছে মেঘ-রাগিণী।
কি লাগিয়া বিজনরাতে
উড়ে হিয়া, হে বিরাগিণী।

এখানে এক একটি পংক্তি এক একটি চরণ, প্রতি চরণে দুইটি পর্ব্ব। প্রথমটি ৪ মাত্রার ও দ্বিতীয়টি ৫ মাত্রার। ৪ ও ৫ মাত্রার পর্ব্বাঙ্গ-সম্বলিত নয় মাত্রার পর্ব্ব এখানে নাই। প্রথমতঃ, পাঁচমাত্রার পর্ব্বাঙ্গ হয় না।

উপরের পংক্তিগুলিতে 'নয়ন-পাতে' 'মেঘ-রাগিণী' প্রভৃতি এক একটি পর্ব্ব, পর্ব্বাঙ্গ নহে; পড়িতে গেলেই একাধিক beat বেশ ধরা পড়ে। লিখিবার কায়দা হইতেও দেখা যায় যে চার মাত্রার পরই একটু বেশী করিয়া ফাঁক রাখা হইয়াছে। তাহাতেও বোঝা যায় যে ঐ স্থানে একটু যতি আছে, অর্থাৎ ঐ খানে পর্ব্ব বিভাগ হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নয়মাত্রার ছন্দের দৃষ্টান্ত হিসাবে যে উদাহরণগুলি রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন, সেগুলি নয়মাত্রার চরণের দৃষ্টান্ত, নয় মাত্রার পর্ব্বের দৃষ্টান্ত নহে।

এইবার crucial test বা চূড়ান্ত প্রমাণের কথা বলি। পর্ব্বমাত্রকেই পর্ব্বাঙ্গে বিভাগ করার নানা সঙ্কেত আছে। আটমাত্রার পর্ব্বকে ৪+৪ অথবা ৩+৩+২ সঙ্কেত অনুসারে, দশমাত্রার পর্ব্বকে ৩+৩+৪,৪+৩+৩, ৪+৪+২, ২+৪+৪ সঙ্কেত অনুসারে পর্ব্বাঙ্গে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু দুইটি পর্ব্বের মোট মাত্রা সমান থাকিলে তাহাদের পর্ব্বাঙ্গ বিভাগের সঙ্কেত বিভিন্ন হইলেও তাহারা একাসনে স্থান পাইতে পারে। নয় মাত্রার ছন্দ বলিয়া যে উদাহরণগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে নানা বিভিন্ন সঙ্কেত আছে। যদি বিভিন্ন সঙ্কেতের পংক্তিগুলির পরস্পর পরিবর্তন দ্বারা ছন্দ অক্ষুণ্ণ থাকে তবেই প্রমাণ হইবে যে পংক্তিগুলি পর্ব্ব। যদি না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে তাহাদের মধ্যে পর্ব্বগত পার্থক্য আছে, এবং মোট মাত্রাসংখ্যা সমান থাকিলেও ঐ কারণে ছন্দ-পতন হইতেছে। অর্থাৎ পংক্তিগুলি চরণ, পর্ব্ব নহে। এইবার পরীক্ষা করা যাক্। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ হইতেই পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

গভীর গুরু গুরু রবে
বাজিতেছে মেঘ-রাগিণী -
মোর ব্যথাখানি লুকায়ে
বসিয়াছিলে একাকিনী।

অর্থের খিচুড়ি হৌক্, ছন্দেরও খিচুড়ি হইতেছে কি? প্রতি পংক্তিতে নয় মাত্রা কিন্তু বজায় আছে।

শুকতারা চাঁদের সাথী
সাথী নাহি পায় আকাশে।
চাঁপা, তোমার আঙিনাতে
ভাসায় নয়ন নীরে সে।

এস্থলে প্রতি পংক্তিতেই নয় মাত্রা আছে, কিন্তু ছন্দ অক্ষুণ্ণ আছে কি?

এই উপলক্ষে শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিকের উদাহরণ কয়েকটির উল্লেখ করিতে চাই। তাঁর রচনা হইতেও ঠিক্ প্রমাণ পাওয়া গেল না, কারণ তাঁহার উদাহরণে প্রতিসম পংক্তিগুলিতে একই সঙ্কেত রাখিয়াছেন। 'গুরু গুরু গর্জ্জন' 'করি বৃন্ত বর্জ্জন' এই দুই পংক্তিতে একই সঙ্কেত, (২+৩)+৪। সেইরূপ 'রাখিলাম নয় মাত্রা' 'করিলাম মহাযাত্রা' এই দুই স্থলে সঙ্কেত (৪+২)+৩। তত্রাচ "ছন্দ কিছু হইয়াছে কিনা ছন্দ-রসিকই বলিতে পারেন।"

এইবার নয়মাত্রার পর্ব্ব রচনা বাংলায় সম্ভব কিনা তৎসম্বন্ধে দু' একটি তর্ক উত্থাপন করিতে চাই। পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের মধ্যে বিচার হিসাবে সেগুলি বোঝান সুবিধা হইবে।

পূঃ পঃ—নয়মাত্রার পর্ব্ব বাংলায় না চলার কোন কারণ নাই। বাংলায় বিষম মাত্রার পর্ব্ব চলে এবং দশমাত্রা পর্য্যন্ত দীর্ঘ পর্ব্বের চলন আছে। সুতরাং নয় মাত্রার পর্ব্ব বেশ চলিতে পারে।

উঃ পঃ—কিন্তু তাহার উদাহরণ দিতে পার?

পূঃ পঃ—উদাহরণ আপাততঃ দিতে পারিতেছি না। এ রকমের পর্ব্ব কবিরা হয়ত ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে করিলেও করিতে পারেন। না করিবার কোন কারণ আছে কি?

উঃ পঃ—আছে। বাংলা ছন্দের পর্ব্বগঠনের রীতি অনুসারে নয়মাত্রার পর্ব্ব রচিত হইতে পারে না।

পূঃ পঃ—কেন?

উঃ পঃ—পর্ব্বমাত্রেই দুইটি বা তিনটি পর্ব্বাঙ্গের সমষ্টি। বাংলায় যখন চার মাত্রার চেয়ে বড় পর্ব্বাঙ্গ চলে না, তখন দুইটি পর্ব্বাঙ্গ দিয়া নয় মাত্রার পর্ব্ব রচিত হইতে পারে না। যদি তিনটি পর্ব্বাঙ্গ দিয়া

নয়মাত্রার পর্ব্ব রচনা করিতে হয়, তবে নিম্নলিখিত কয়েকটি সঙ্কেতের অনুসরণ করিতে হইবে। (অ) ২+৩+৪ (আ) ৪+৩+২ (ই) ২+৪+৩ (ঈ) ৩+৪+২ (উ) ৩+৩+৩ (ঊ) ৩+২+৪ (ঋ) ৪+২+৩ (এ) ৪+৪+১ (ঐ) ৪+১+৪ (ও) ১+৪+৪। কিন্তু এই দশটির মধ্যে (ই), (ঈ), (ঊ), (ঋ), (ঐ) নামক সঙ্কেতগুলি অচল, কারণ তাহাতে দৈর্ঘ্যের ক্রম অনুসারে পর্ব্বাঙ্গগুলিকে সাজান হয় নাই, সুতরাং বাংলা ছন্দের একটি মূল রীতির ব্যভিচার হইয়াছে। বাকী রহিল পাঁচটি,—(অ), (আ), (উ), (এ), (ও)। তন্মধ্যে (অ), (আ), (এ), (ও) নামক সঙ্কেতে যুগ্ম মাত্রার ও অযুগ্ম মাত্রার পর্ব্বাঙ্গের পর পর সন্নিবেশ হইয়াছে। বিষম মাত্রার পর্ব্বাঙ্গ পর পর থাকিলে একটা উচ্ছল, চপল ভাব আসে, তজ্জন্য অবিলম্বে যতি স্থাপন করিয়া ছন্দের ভারসাম্য রক্ষা করিতে হয়; অর্থাৎ কেবলমাত্র দুই পর্ব্বাঙ্গযোগে রচিত পর্ব্বেই বিষম মাত্রার পর্ব্বাঙ্গ ব্যবহৃত হইতে পারে। তিন পর্ব্বাঙ্গবিশিষ্ট পর্ব্বে অযুগ্ম মাত্রার পর্ব্বাঙ্গ ব্যবহৃত হইলেই তাহার পর আর একটি অযুগ্ম মাত্রার পর্ব্বাঙ্গ বসাইয়া ছন্দের সাম্য রক্ষা করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্রে' ছন্দ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন তাহাতেও এই তত্ত্বের আভাস আছে। 'পরিচয়ে'ও রবীন্দ্রনাথ নয় মাত্রার ছন্দের যে উদাহরণগুলি দিয়াছেন সেগুলিতে যে পংক্তিতে বাস্তবিক একাধিক পর্ব্বের ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা হইতেও একথা প্রমাণ হয়।

পূঃ পঃ—কিন্তু (উ) চিহ্নিত পর্ব্বাঙ্গে ত কোন রীতিরই ব্যত্যয় হয় নাই।

উঃ পঃ—হয় নাই বটে, কিন্তু সেখানে ছয় মাত্রায় পর্ব্ব বিভাগ করার প্রবৃত্তি এত সহজে আসে যে নয় মাত্রার পর্ব্ব আর থাকে না। নয় অযুগ্ম সংখ্যা। অযুগ্ম সংখ্যার পর্ব্ব বাংলায় বেশী ব্যবহার হয় না। পাঁচ ও সাত মাত্রার পর্ব্ব বাংলায় চলে, কিন্তু Syncopated movement বা খঞ্জগতির পর্ব্ব হিসাবেই তাহারা চলে। সেজন্য দুইটি মাত্র বিষম মাত্রার পর্ব্বাঙ্গের পরস্পর সান্নিধ্য আবশ্যক

সম মাত্রার তিনটি পর্ব্বাঙ্গ দিয়া Syncopated movement রাখা যায় না।

পূঃ পঃ—এ সমস্ত যুক্তির সারবত্তা যথেষ্ট আছে বটে, তত্রাচ ৩+৩+২ সঙ্কেতের পর্ব্ব চলিবে না কেন? অবশ্য Syncopated movement না হইতে পারে, কিন্তু—অন্য রকমের গতিও ত সম্ভব। কোন ভবিষ্যৎ ছন্দ-শিল্পীর রচনায় একথা প্রমাণ হইতে পারে।

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

রাজা রামমোহনের রাজনৈতিক শিষ্যদল

রাজা রামমোহনের ভাবসম্পদকে অবলম্বন করিয়া একদিকে যেমন এক অপূর্ব্ব শক্তিশালী ধর্ম্মসংস্কারকদল গড়িয়া উঠিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক সংস্কারকদল আবির্ভূত হইয়াছিল। রাজা রামমোহনের মৃত্যুর পর হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন পর্য্যন্ত দশবৎসরকাল (১৮৩৩—১৮৪৩ খৃঃ অঃ) ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলনে মন্দা পড়ে। আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ঐ সময়ে কোনরূপে রাজা রামমোহনের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলন বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। রাজার বিলাত যাত্রার পর হইতেই কিরূপে ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলনের প্রভাব হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয় তাহার একটি নূতন প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। রাজার সহিত অন্তরঙ্গতার ফলে প্রসন্নকুমার ঠাকুর মূর্ত্তিপূজায় আস্থাহীন হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের "ইণ্ডিয়া গেজেট" হইতে জানা যায় যে ঐ বৎসর প্রসন্নকুমার দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। নব্যবঙ্গের গুরু ডিরোজিও সাহেব তাঁহার সম্পাদিত "East Indian" কাগজে এজন্য প্রসন্নকুমারকে অনেক বিদ্রূপ করেন (India Gazette ১৯শে অক্টোবর ১৮৩১ খৃঃ অঃ দ্রষ্টব্য)। উক্ত দশবৎসরকালের মধ্যে রাজার ধর্ম্মমত বঙ্গদেশে অনাদৃত হইলেও, তাঁহার রাজনৈতিক মত ও কর্ম্মপ্রণালী বাঙ্গালার নেতৃবর্গ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দশবৎসরে রাজা রামমোহনের রাজনৈতিক প্রভাব বঙ্গদেশে কিরূপে অনুভূত হইয়াছিল তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচ্য।

রাজা রামমোহন বিধিসঙ্গত প্রণালীতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করিয়া দেশের দুর্দ্দশা অপনোদন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করিয়া অন্যায় অবিচারের প্রতীকার-চেষ্টা কেহ করেন নাই। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লইয়া তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ভারতীয় জনগণের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত করেন। বিচার ও রাজস্বসংক্রান্ত ব্যবস্থায় যে সকল দোষ ও ত্রুটি ছিল সেগুলি দূর করিবার জন্য, ও শিক্ষিত-জনমতের সাহায্যে বিধি প্রণয়ন করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তনের

জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চেষ্টার সাফল্যের নিমিত্ত তিনি একদিকে বাঙ্গালা সংবাদপত্র পরিচালনা করিয়া দেশের জনমত গঠন করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, অপরদিকে ইংরাজের পরিচালিত সংবাদপত্রের সাহায্যে ভারত-শাসন বিষয়ে ইংরাজদের সদ্বুদ্ধি জাগরিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ভারতীয় শাসন-পদ্ধতির সংস্কার সাধন করিতে হইলে ইংলণ্ডের জনমতকেও ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করিতে হইবে, ইহা তাঁহার ধারণা ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের বাসনা তাঁহার বিলাত যাত্রার অন্যতম কারণ। তিনি ইংরাজদিগের সহিত সহযোগিতা করিয়া ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি-প্রয়াসের পক্ষপাতী ছিলেন।

কিন্তু তাঁহার বিলাতগমনের পর বাঙ্গালার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুইটি বিভিন্ন দলের আবির্ভাব হয়। একদল সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা লাভ করেন ফরাসী বিপ্লব হইতে। এইদলের একজন লেখক "Old Hindu" ছদ্মনামে "বেঙ্গল হরকরায়" ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি প্রবন্ধে এই ভাব প্রকাশ করেন যে ভারতবর্ষে ফরাসী বিপ্লবের অনুরূপ এক বিপ্লব ঘটিবার প্রয়োজন আছে। ইঁহারাই বোধ হয় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের সময় কলিকাতার মনুমেণ্টের চূড়ায় ত্রিবর্ণের বিপ্লবী পতাকা উড়াইয়া দিয়াছিলেন। "So great a favourite is the tri-colour at Calcutta, that we find it stated in the 'John Bull', that on Christmas day, it was hoisted along with the English on the top of Sir David Ochterlony's Monument." (Asiatic Intelligence, June, 1831.) এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে একশত বৎসর পরেও ভারতবর্ষের তরুণেরা সরকারী প্রতিষ্ঠানে নিজেদের মনোমত পতাকা উড়াইয়া স্বাধীনতা লাভের মোহমরীচিকা হইতে মুক্তিলাভ করে নাই। যাহা হউক, উক্ত দলের সমর্থক সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। তাঁহারা সকলেই নূতন আমদানী ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত। তাঁহারা রাষ্ট্রের স্বরূপ কি, শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ, সরকার কি কি কার্য্য করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য এই সকল দার্শনিক বিষয় আলোচনা করিতেন। ইঁহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বেন্থামের ও অর্থনীতিতে অ্যাডাম্ স্মিথের মতানুবর্ত্তী ছিলেন। ইঁহাদের সর্ব্বপ্রধান মুখপত্র ছিল

"জ্ঞানান্বেষণ"। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চর্চ্চা আজও আমাদের দেশে বিশেষ কিছু হয় নাই। কিন্তু একশত বৎসর পূর্ব্বে ইহারা মূলতঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা করিবার জন্যই "জ্ঞানান্বেষণ" বাহির করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের Calcutta Quarterly Magazine and Review পত্রিকায় (৪১৭ পৃষ্ঠায়] "জ্ঞানান্বেষণ" সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—"The object of the Journal is the instruction of the Hindoos in the science of Government and Jurisprudence, and it adds to its crude essays on these abstruse points a few brief items of intelligence"। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ও কিছুদিন পরে অক্ষয়কুমার দত্ত এই বুদ্ধিজীবী চরমপন্থীদলের পরিচালনা করেন। আমি এই দলকে ভারতীয় "Philosophical Radicals" নামে অভিহিত করিয়াছি। ইঁহাদের কথা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। শুধু এই দলের সহিত রামমোহনী রাজনৈতিক দলের পার্থক্য নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে দু'একটি কথা বলিলাম।

রামমোহনীদল রাষ্ট্রের দার্শনিক ব্যাখ্যায় কালক্ষেপ না করিয়া কতকগুলি বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক অভিযোগ লইয়া আন্দোলন করিতেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজার বিলাত গমন হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু পর্য্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই দলের প্রাধান্য ও ১৮৬১ হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ কংগ্রেস স্থাপনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দলের গৌণ প্রভাবের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে রাজার সাক্ষাৎ শিষ্যদল অর্থাৎ যাঁহারা রাজার সঙ্গে একযোগে কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন ও রাজার রাজনৈতিক আদর্শকে সফল করাই যাঁহারা জীবনের ব্রত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা আলোচনা করিব। ইহাদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও জন্ অ্যাডামের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের রাজনৈতিক উদ্যম ১৮৩০ হইতে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। তৎপরে রামমোহনের আবহাওয়ায় মানুষ অথচ তাঁহার দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষিত নহেন এইরূপ ব্যক্তিগণের হাতে রাজনৈতিক

আন্দোলনের পরিচালনা-ভার আসে। এই দ্বিতীয় রামমোহনী দলে নাগরি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৪৩ হইতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নেতৃত্ব করেন। তারপর ১৮৬১ হইতে ১৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজা দিগম্বর মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ রামমোহনী রাজনৈতিক ধারা বজায় রাখিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু ক্রমোন্নতিশীল গণতান্ত্রিকদলের সহিত সংঘর্ষে তাঁহারা ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইয়া পড়েন।

রাজা রামমোহন যখন বিলাত-যাত্রা করিলেন তখন তাঁহার আরব্ধ রাজনৈতিক ব্রত উদ্‌যাপনের ভার লইয়াছিলেন প্রধানতঃ তাঁহার দুই অনুরক্ত বন্ধু—প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রসন্নকুমার ঠাকুর 'The Reformer' নামে একখানি পত্রিকা বাহির করেন। Calcutta Quarterly Magazine and Review পত্রিকার ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের The Calcutta Press নামক প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে "Reformer"-এর ৪০০ গ্রাহক ছিল, জ্ঞানান্বেষণের ১০০, India Gazetteএর ৩৭৫ Calcutta Courier এর ১৭৫, Bengal Heraldএর ২৪২, Enquirer এর ২০০ ছিল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাইয়ের Friend of India হইতে জানা যায় যে সুপ্রতিষ্ঠিত "সমাচার-দর্পণের" মাত্র চারিশত গ্রাহক ছিল। সুতরাং Reformer সে যুগের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকার মধ্যে স্থান পাইত তাহা জানা যাইতেছে। আর Reformer যে রাজা রামমোহনের দলেরই মুখপত্র ছিল তাহাও Dr. Duffএর সমসাময়িক নিম্নলিখিত বাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে—

"It represented the sentiments of a party not large in number but potent in rank and wealth, the party of the celebrated Raja Rammohun Roy."

প্রসন্নকুমার রাজা রামমোহনের নিকট হইতে ইংরাজ শাসনের প্রতি অনুরাগ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি রামমোহনের রাজনৈতিক-সংস্কার-প্রিয়তারও উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে

তাঁহার কাগজে তিনি "শিক্ষিত হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় মত" নামে যে ইংরাজী প্রবন্ধ লেখেন তাহা India Gazetteএ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে উদ্ধৃত হয়। উক্ত প্রবন্ধে প্রসন্নকুমার বলেন,—"যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয় ইংরাজ কিংবা অন্য শাসন আমরা পছন্দ করি, তাহা হইলে আমরা সকলে একবাক্যে বলিব ইংরাজ শাসনই আমরা সর্ব্বতোভাবে পছন্দ করি, এমন কি হিন্দুশাসনের চেয়েও। কিন্তু মনুষ্যকৃত কোন প্রতিষ্ঠানই দোষহীন নহে, এবং সকল প্রতিষ্ঠানেরই উন্নতি সাধন করা সম্ভব। সেইজন্য আমরা বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির দোষ ত্রুটি প্রদর্শন করিতেছি ও তাহার উন্নতির জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিতেছি।" কিন্তু তিনি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের অন্য একটি প্রবন্ধে—যাহা Englishmanএ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে উদ্ধৃত হইয়াছে—বলেন যে যদি যোগ্য ভারতীয়গণকে কোন উচ্চপদ না দেওয়া হয়, যদি তাহাদিগকে রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হয়, তবে কি তাহারা ইংরাজ, ফরাসী বা রুষীয় অধিকার সম্বন্ধে সমান উদাসীনতা দেখাইবে না? রাজা রামমোহনের ন্যায় প্রসন্নকুমার ভারতীয়গণকে যোগ্যপদে নিযুক্ত করিবার জন্য ক্রমাগত আন্দোলন চালাইতে থাকেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চ তারিখে তিনি দেখেন যে ভারতে যখন বৃটিশ রাজত্বের সূত্রপাত হয় তখন ইংরাজেরা ভারতীয়গণকে উচ্চতম পদ ও বেতন দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি রাজা রাজবল্লভের কথা উল্লেখ করেন।—

Raja Rajballava "was the senior member of the Revenue Board on a salary of rupees 5000, and had according to the rule of that period a seat in the council."

(Asiatic Intelligence, October 1832 হইতে উদ্ধৃত। 'Reformer' এর কোন সংখ্যা আমি দেখিতে পাই নাই বলিয়া সমসাময়িক কাগজপত্র ঘাঁটিয়া 'Reformer'এর লেখা যেখানে যেখানে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা সংগ্রহ করিয়াছি)।

প্রসন্নকুমার এদেশে জুরীর বিচার প্রচলনের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন (Asiatic Intelligence Dec. 1832 ও India Gazette

January 29, 1833-র 'Reformer' হইতে উদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য)। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতের গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি কি করিয়া ক্রমে ক্রমে লোপ পাইল তাহার সম্বন্ধে প্রসন্নকুমারের গবেষণা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন যে প্রথমে নিগমসভা (Trade guild) ও গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ মোকদ্দমার চূড়ান্ত বিচার করিতে পারিত। তখন দেশে গণতান্ত্রিক-ভাব প্রবল ছিল। ক্রমে পুরোহিত সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রে স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের বৃদ্ধি হইলে নিগম ও পঞ্চায়েতের ক্ষমতা হ্রাস পাইতে লাগিল ও প্রাথমিক বিচারের ক্ষমতা তাহাদের হাতে থাকিলেও, চূড়ান্ত বিচারের ভার পাইলেন রাজা। রাজা রামমোহন ভারতীয় ইতিহাসে রাষ্ট্রের ক্রমপরিবর্ত্তনের যে ব্যাখ্যা ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে 'Brief Remarks regarding modern encroachments on the ancient rights of Females, according to the Hindu Law of Inheritance" নামক প্রবন্ধে প্রকাশ করেন (পাণিনি আফিসের ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের প্রকাশিত রাজার ইংরাজী গ্রন্থাবলীর ৩৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), তাহার প্রভাব প্রসন্নকুমারের উপর কিরূপভাবে পড়িয়াছিল তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতে বুঝা যাইবে।

"Superstition, which was the prolific source of despotism and the stronghold of priestcraft, contributed not a little to deprive the people of their just rights, by adding undue authority to the privileges of the crown. The ministers of religion, who were also the legislators, easily discovered the weakness of a people, who from ignorance was credulous of the most absurd doctrines, which were offered for their belief, and to place their power on a firm basis. they connived with the rulers of the land to increase their power by sacrificing the rights of the people, which were in a manner entrusted to their charge by the credulous mob. Thus the appeal from the verdict of the punchait was made to rest with the king. (Asiatic Intelligence December 1832 সংখ্যায় Reformer হইতে উদ্ধৃত।

রাজা রামমোহন বলিয়াছিলেন যে আর কোন প্রয়োজনে না হউক, ভারতীয়গণের রাজনৈতিক উন্নতির জন্যও, অন্ততঃ, সমাজ ও ধর্ম্মের সংস্কার সাধন প্রয়োজন। এই বাক্যের অর্থ সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে

রামমোহনী চিন্তাধারায় সামাজিক অবস্থার সহিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা কিরূপ অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট তাহা জানা দরকার। প্রসন্নকুমারের উল্লিখিত বাক্য হইতে আমরা উক্ত চিন্তা-প্রণালীর পরিচয় পাইতেছি এবং বুঝিতে পারিতেছি যে রাজা রামমোহন কেন সমাজসংস্কারের উপর এত বেশী জোর দিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন ইংরাজ-পরিচালিত সংবাদপত্রের সাহায্যে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইবার পথ দেখাইয়া যান। দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় সেই পথ অনুসরণ করিয়া ৩৪০০০ টাকা দিয়া India Gazette-এর স্বত্ব ক্রয় করেন ও ঐ পত্র Bengal Chronicle এর সহিত যোগ করিয়া দেন (Asiatic Intelligence, April, 1835 দ্রষ্টব্য)। পরে তিনি "বেঙ্গল হরকরা"র কিছু অংশের স্বত্বও ক্রয় করেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র বলেন যে "John Bull" কাগজ দেশীয় লোকদের উপর যে বর্ব্বরোচিত অন্যায় আক্রমণ করিতেছিল তাহার জবাব দিবার জন্যই তিনি ঐ কাগজের স্বত্ব ক্রয় করিয়াছিলেন (Memoirs of Dwarkanath Tagore, revised and enlarged edition of 1870, ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

দ্বারকানাথ ঠাকুর রাজা রামমোহনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশবাসীর মধ্যে রাষ্ট্রীয় বোধ জাগরিত করিবার প্রয়াস পান। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন তারিখের একটি সভায় তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে "আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের ধারণা যে একচক্ষু হারাইলে অপরটিরই মাত্র যত্ন করা উচিত; সেইজন্য তাহারা রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের কোনই চেষ্টা করে না এবং প্রকাশ্য সভাসমিতি হইতে নিজেদিগকে দূরে রাখে।" তিনি রামমোহনের মতনই বিশ্বাস করিতেন যে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হইলে দেশের লোকের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা অবশ্যই আসিবে। কতকগুলি শিক্ষিত ইংরাজ পরিবারকে এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা করিতে পারিলে তাহাদের সহিত সংসর্গের ফলে ও তাহাদের চেষ্টায় এদেশের লোকের রাষ্ট্রীয় উন্নতি সাধিত হইবে—এই ধারণা রাজা রামমোহন পোষণ করিতেন ও দ্বারকানাথ তাহার সমর্থন করিতেন। রাজা রামমোহন জুরীর বিচার প্রবর্ত্তনের জন্য বিলাতে আন্দোলন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই তারিখে দ্বারকানাথ এক বিরাট সভা আহ্বান করিয়া সুপ্রিম

কোর্টে জুরীর বিচার প্রবর্ত্তন প্রার্থনা করেন। রাজা রামমোহন অশেষবিধ চেষ্টা করিয়াও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা আনয়ন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বন্ধুগণ এই প্রশংসনীয় উদ্যম পরিত্যাগ করেন নাই। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী তারিখে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-নিরোধক আইন রদ্ করিবার জন্য একটি সভা হয়। তাহাতে দ্বারকানাথ বলেন—"আজ এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে যাইয়া আমি সেই কার্য্যের মাত্র পুনরাবৃত্তি করিতেছি যাহা দশবৎসর পূর্ব্বে আমি করিয়াছিলাম। যখন এই রেগুলেশন প্রথম জারী হয় তখন আমি, আমার ৩।৪জন আত্মীয় ও আমার মৃতবন্ধু রামমোহন রায় এই কয়জনমাত্র উহার বিরুদ্ধে সুপ্রিম্ কোর্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলাম।......আর কোন বাঙ্গালীকে আমাদের সহিত তখন যোগ দেওয়াইতে পারি নাই। তখন অনেকেই ভাবিয়াছিল যে আমার দুঃসাহসিকতার জন্য আমাকে বুঝি পরদিনই ফাঁসীকাঠে ঝুলান হইবে।" (ভোলানাথ চন্দ্র কৃত Life of Digamber Mitra Vol. I দ্রষ্টব্য)।

প্রসন্নকুমার ও দ্বারকানাথ কেবলমাত্র সংবাদপত্রে ও সাময়িক সভার সাহায্যে রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা উক্ত উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য স্থায়ী প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার বিষয়ে রাজা রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন, রাজা রামমোহনের বিরোধিতা করিলেও, রাজার মৃত্যুর চার বৎসর পরে তাঁহারা রাজার সহকর্ম্মী প্রসন্নকুমারের সহযোগিতায় Zamindary Association বা Landholders' Society নামক বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইহার সম্পাদক হয়েন (The Bengal Harukaru, August 15, 1843 দ্রষ্টব্য)। রাজা রামমোহনের নীতি অনুসরণ করিয়া এই সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ ইংরাজ সভ্যও গ্রহণ করিতেন। তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার Mr. Turton উক্ত সভার ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নবেম্বরের অধিবেশনে সভার সভ্যগণের মনোভাব ও রাজনৈতিক আশা নিম্নলিখিত বাক্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেন :—

"It was not as a conquered nation that he desired to retain the inhabitants of India as British subjects, but as

brethren in every respect; as constituting a part of the Kingdom of Great Britain, as fellow subjects—with the same feelings, the same interests and objects and the same rights as the British-born inhabitants of England."

রাজা রামমোহনের রাষ্ট্রীয় আদর্শও ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে সমানের অধিকার লাভ করা। উদ্ধৃত বাক্যটি আলোচনা করিতে যাইয়া মনে রাখিতে হইবে যে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে Durham Report প্রকাশিত হয় নাই। ইতিহাসের প্রত্যেক ছাত্রই জানেন যে Durham Reportএই সর্ব্বপ্রথমে Dominion Statusএর ভাব জন্মলাভ করে। কিন্তু ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের আশা রাজা রামমোহনের মনেই প্রথম জাগরিত হয় ও তাহার সুস্পষ্ট রূপ পাওয়া যায় রাজার শিষ্যদলের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। উক্ত প্রতিষ্ঠান মূলতঃ জমীদারদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য স্থাপিত হইলেও দেশের জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় চৈতন্য উদ্বোধনে ও অধিকারলাভের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েসনের প্রসন্নকুমার-স্মৃতিসভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতেও এইরূপ কথা বলিয়াছেন (বাবু যোগেশ্বর মিত্র সম্পাদিত ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বক্তৃতাবলীর ২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। "জমীদারী সভা"র কার্য্যপ্রণালী আলোচনা করিলে মনে হয় ইংলণ্ডের ব্যারণগণ যেমন স্বেচ্ছাচারী রাজা জন্-এর বিরুদ্ধে লড়িতে যাইয়া নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বসাধারণের রাষ্ট্রীয় অবস্থার উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন, তেমনি আমাদের দেশের জমীদারেরা সেই যুগে নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় অধিকার বজায় রাখিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

যখন প্রসন্নকুমার ও দ্বারকানাথের চেষ্টায় বঙ্গদেশে জনমত গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন রাজা রামমোহনের অপর একজন সহকর্ম্মী শিষ্য বিলাতের জনসাধারণকে ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইনি রেভারেণ্ড উইলিয়ম অ্যাডাম্। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের "Bengal Spectator" নামক পত্রিকা (১৬ পৃষ্ঠা) হইতে জানা যায় যে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইনি ইংলণ্ডে British India Society নামে এক সভা

স্থাপন করেন। ভারতীয় জনগণের উন্নতি সাধন করা ঐ সভার উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ঐ সভার মুখপত্ররূপে অ্যাডাম সাহেবের সম্পাদকতায় "British India Advocate" নামে একখানি কাগজ বাহির হয়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চের "বেঙ্গল হরকরায়" উক্ত কাগজের সমালোচনায় লিখিত হয় যে উহা আট পৃষ্ঠার এক কাগজ এবং উহার আকার বিকট, "with a repulsive physiognomy"। যাহা হউক জমীদার সভার ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নবেম্বরের অধিবেশনে লণ্ডনের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর সহিত সহযোগিতা করিবার এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। দ্বারকানাথ ঐ অধিবেশনে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন। সভায় স্থির হয় যে নিম্নলিখিত চারিটি বিষয়ে লণ্ডনের সভার মনোযোগ আকর্ষণ করা হইবে—(১) লাখেরাজ জমি যাহাতে বাজেয়াপ্ত না হয়; (২) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা তদনুরূপ কোন বন্দোবস্ত ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যাহাতে বিস্তৃত হয়; (৩) রাজস্ব, বিচার ও পুলিশ বিভাগের এরূপ সংস্কার সাধন করা যাহাতে সকল শ্রেণীর লোকের ধনপ্রাণ রক্ষা পায়; (৪) পতিত জমি এরূপভাবে বণ্টন করা হউক যাহাতে ধন উৎপাদনের সুবিধা হয় (১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের বেঙ্গল হরকরার ১৪ই ও ১৬ই ডিসেম্বর সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর উপর ভারতের উন্নতি সাধনের ভার অর্পণ করিয়া রামমোহনের শিষ্যদল নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তাঁহারা একজন সদ্বক্তা ও সুপরিচিত ইংরাজকে জমীদার সভার এজেণ্টরূপে বিলাতে রাখিবার সঙ্কল্প করেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রস্তাবে ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমর্থনে জর্জ্জ টম্‌সন্ সাহেব উক্ত পদে নিযুক্ত হয়েন।

রাজা রামমোহন বিলাতে কিরূপ অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা দ্বারকানাথের অবিদিত ছিল না। সেইজন্য তিনি নিজে বিলাতে যাইয়া দেশের উন্নতিবিধান করিতে মনোযোগী হইলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী তারিখে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে তিনি জর্জ্জ টম্‌সনের সহিত পরিচিত হইলেন ও বাঙ্গালার যুবকবৃন্দকে বৈধপ্রণালীতে রাজনৈতিক আন্দোলন শিখাইবার জন্য তাঁহাকে এদেশে আনিবার ব্যবস্থা করিলেন। জর্জ্জ টমসন বিলাতে নিজের বিদায় সভায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে তিনি

নিজে ইচ্ছা করিয়া ভারতবর্ষে যাইতেছেন না, পরন্তু দ্বারকানাথের আগ্রহে ও যত্নে তথায় যাইতেছেন। দ্বারকানাথ যে তাঁহার ব্যয়ভার ও পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করিয়াছেন সে কথাও জর্জ্জ টম্‌সন্ ইঙ্গিতে বলেন। (উক্ত বক্তৃতা ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবরে Scotsman পত্রিকায় বাহির হয় ও বেঙ্গল হরকরায় ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী তারিখে উদ্ধৃত হয়। Bengal Spectatorএ বা যোগেশ্বর মিত্র সম্পাদিত (১৮৯৫) জর্জ্জ টম্‌সনের বক্তৃতাবলীতে উহা স্থান পায় নাই)। উক্ত বক্তৃতা হইতে বুঝা যায় যে দ্বারকানাথ বঙ্গীয় যুবকগণকে রাষ্ট্রীয় সাধনায় প্রবৃত্ত করাইবার জন্য কতদূর আগ্রহশীল ছিলেন ও কি পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়াছিলেন।

জর্জ্জ টমসনের বঙ্গদেশে আগমন ও কলিকাতার বিভিন্নস্থানে বক্তৃতা ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ইতিহাসের এক চিরস্মরণীয় ঘটনা। তিনি বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায়কে উপদেশ দেন—

"To abhor expediency, to stand boldly for the cause of righteousness and to make organised efforts to secure the protection and security which the constitution of England guarantees."

তাঁহার বক্তৃতার ফলে, ও দ্বারকানাথের অনুসৃত কার্য্যপ্রণালীর ফলে, হিন্দুকলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদলের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইবার ইচ্ছা জন্মে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে হিন্দুকলেজ হইতে শিক্ষিত যুবকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই philosophical radicals বা আদর্শবাদী চরমপন্থী ছিলেন। দ্বারকানাথ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড অকল্যাণ্ড কর্তৃক নিযুক্ত বঙ্গীয় পুলিশসংস্কারক কমিটির নিকট যে সাক্ষ্য দেন তাহাতে শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকগণের জন্য এক নূতন পদ সৃষ্টি করিতে সরকারকে উপদেশ দেন। ঐ পদের নামই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী। তিনি বলেন—

"They (the deputy magistrates) should be stationed in the interior and their powers in criminal cases should correspond with those of moonsiffs, and they should be allowed to exercise jurisdiction over the Thanadars"

তাঁহার প্রস্তাবের অনুরূপ প্রস্তাব Mr. Dampierও করেন।

(Report of the committee formed by Lord Aukland in 1838 to investigate the state of Bengal Police, dated 18th August, 1838—৮ হইতে ১১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য। ইহা কিশোরীচাঁদ মিত্রকৃত দ্বারকানাথের জীবনীতে উদ্ধৃত বা উল্লিখিত হয় নাই)। দ্বারকানাথের প্রস্তাব অনুসারে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট উক্ত পদ স্থষ্টি করিয়া চরমপন্থী কয়েক জন শিক্ষিত যুবককে উহাতে নিযুক্ত করেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, মাধবচন্দ্র মল্লিক প্রভৃতি খ্যাতনামা হিন্দুকলেজের ছাত্রগণ সরকারী চাকুরী গ্রহণ করায় আদর্শবাদী চরমপন্থীদল ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এদিকে আবার ঐ দলের ত্রাণস্বরূপ তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী দ্বারকানাথ ও জর্জ্জ টম্সনের সহিত মিলিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে বৈধ আন্দোলনে যোগ দেন।

এক্ষণে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা প্রয়োজন। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী রামমোহনী দলের ও চরমপন্থী দলের মধ্যে সেতুস্বরূপ। তিনি রাজা রামমোহনের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন—এমন কি রাজাকে পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য-কর্ম্মসম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিতে সাহসী হইতেন বলিয়া কথিত আছে। তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক। যখন হিন্দুকলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রগণ "society for the acquisition of general knowledge" স্থাপন করেন তখন তারাচাঁদকেই তাঁহারা সভাপতির পদে বৃত করেন। তাঁহার সম্বন্ধে জর্জ্জ টম্সন্ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিলের সভায় বলেন :—

A man whose earnest though quiet zeal, whose retiring modesty, benevolent feelings and whose incorruptible integrity entitled him and had, he believed, won for him the esteem and admiration of all who knew him."

তারাচাঁদ কিরূপ নির্ভীক ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ছিলেন তাহা ক্যাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ডসনের সহিত তাঁহার ব্যবহারে বুঝা যায়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে হিন্দুকলেজের হলে "জ্ঞানান্বেষণী সভা"র এক অধিবেশন হয়। উহাতে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় চরমপন্থী দলের মুখপাত্ররূপে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের তীব্র সমালোচনা করিয়া "The present state of the East India Company's criminal judicature

and Police under the Bengal Presidency" নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। যখন তিনি প্রায় অর্দ্ধেক প্রবন্ধ পড়িয়াছেন তখন হিন্দুকলেজের প্রিন্সিপাল, সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন তাঁহাকে বাধা দিয়া বলেন যে তিনি (প্রিন্সিপাল) কলেজের হলকে "den of treason" হইতে দিতে পারেন না। তখন তারাচাঁদ ক্যাপ্টেন ডি, এল, রিচার্ডসনকে যেরূপ অটল গাম্ভীর্য্যের সহিত তিরস্কার করিয়াছিলেন, তাহা "বেঙ্গল হরকরার" পুরানো ফাইলের সমাধি হইতে উদ্ধার পাইবার যোগ্য। "জ্ঞানান্বেষণী সভা"র সভাপতি তারাচাঁদ বলিলেন—

"Captain Richardson ! With due respect, I beg to say, that I cannot allow you to proceed any longer in this course of conduct towards our Society, and as the President of the Society, and on behalf of my friend Babu Dukhin I must say that your remarks are anything but becoming. I am bound to add that I consider your conduct as an insult to the Society, and if you do not retract what you have said and make due apology, we shall represent the matter to the committee of the Hindu College, and if necessary to the Government itself. We have obtained the use of this public hall by leave, applied for, received from the committee, and not through your personal favour. You are only a visitor on this occasion, and possess no right to interrupt a member of this Society in the utterance of his opinions. I hope that Captain Richardson will see the propriety of offering an apology to my friend, the writer of the essay and to the meeting." (বেঙ্গল হরকরা, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৩ দ্রষ্টব্য)।

ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন্ প্রকাশ্যভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া 'বেঙ্গল হরকরায়' উহা ছাপিত দিয়াছিলেন।

Philosophical Radical সম্প্রদায়ের নেতা তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী জর্জ্জ টম্সনের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া এবং সম্ভবতঃ দ্বারকানাথের অনুরোধে প্রভাবান্বিত হইয়া বৈধভাবে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন করিবার জন্য প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে উদ্যোগী হইলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২০শে এপ্রিল তারিখে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর সমবেত চেষ্টায় The Bengal British India Society

স্থাপিত হইল। 'জমীদার সভা' ছিল ধনী অভিজাতদের সভা, আর এই নূতন প্রতিষ্ঠান হইল বুদ্ধিজীবী অভিজাতদের সভা। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে যেমন 'জমীদার সভা' স্থাপনে রামমোহন-শিষ্য প্রসন্নকুমার উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তেমনি 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' স্থাপনে রামমোহনের দুই প্রিয়তম শিষ্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। ২০শে এপ্রিলের সভায় "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি" স্থাপনের প্রস্তাব করিবার ভার পড়ে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেবের উপর। তারাচাঁদের প্রস্তাবে ও চন্দ্রশেখরের সমর্থনে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল :—

"That a Society be now formed, and denominated, the Bengal British India Society, the object of which shall be the collection and dissemination of information, relating to the actual condition of the people of British India and the laws and institutions, and resources of the country and to employ such other means of a peaceable and lawful character, as may appear calculated to secure the welfare, extend the just rights and advance the interests of all classes of our fellow subjects."

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেস স্থাপনের বীজ এইরূপে উপ্ত হইল।

রাজা রামমোহনের আর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু—আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই সময়ে কেবল যে মৃতপ্রায় ধর্ম্মান্দোলনকে বাঁচাইয়া রাখিতেছিলেন তাহা নহে, পরন্তু রাজার ঈপ্সিত রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যে দেশবাসিগণকে পৌঁছাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত—ইংরাজী বোধহয় জানিতেনই না, অথচ তিনি যদি রাষ্ট্র, ব্যবস্থাশাস্ত্র, আন্তর্জ্জাতিক আইন প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় দর্শনের কঠিন বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া থাকেন, তবে বলিতে হইবে যে রাজা রামমোহনই তাঁহাকে এই সকল বিষয়ের সহিত পরিচিত করাইয়া ছিলেন। তিনি ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের ছাত্রদের নিকট "নীতিদর্শন" সম্বন্ধে ২৪টি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি রাষ্ট্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত :—১০নং স্বাদেশিকতা (Patriotism); ১৯নং যুদ্ধ ও সন্ধি ; ২০নং শাসন ব্যবস্থার উৎপত্তি, প্রয়োজন ও বিভিন্ন রূপ (On the origin and necessity of the Government and the principal forms thereof now prevalent in the world); ২১নং বিধিসঙ্গত কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি বশ্যতা স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা ও প্রজার স্বাধীনতা (On the necessity of obedience to the lawful authority and the liberty of the subject); ২২নং আইনের উৎপত্তি; ২৩নং আন্তর্জ্জাতিক বিধান। (বেঙ্গল হরকরা ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪১ দ্রষ্টব্য। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহর্ষির 'আত্মচরিতে'র পঞ্চদশ পরিশিষ্টে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের লেখা নীতি-দর্শন নামে একখানি বইয়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আমি অন্যান্য স্থানে অনুসন্ধানের পর তাঁহার নিকট ঐ বইয়ের খোঁজ জানিতে চাহিলে তিনি বলেন যে তিনিও ঐ বই কোথাও পান নাই। যদি কেহ দয়া করিয়া ঐ বইয়ের সন্ধান দেন তবে বড়ই উপকার হয়)। রাজা রামমোহন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কতদূর অনুরক্ত ছিলেন তাহা আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের উল্লিখিত বিষয়ের উপর বক্তৃতা হইতে সবচেয়ে বেশী বুঝা যায়।

১৮৩৩ হইতে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসরকালের মধ্যে রাজার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও শিষ্যবর্গ তাঁহার রাষ্ট্রীয় সাধনাকে সফল করিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার অভিপ্রেত ধর্ম্মসংস্কার-আন্দোলন চালাইবার জন্য সেরূপ যত্ন লয়েন নাই।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

গত সংখ্যার ভ্রম সংশোধন :—৯৫ পৃষ্ঠা ১৭ লাইনে ১৮৮৩ এর বদলে ১৮৩৩ হইবে।

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যখন বিলেত রওয়ানা হই, তখন আমার বয়স কুড়ি বছরও পূর্ণ হয়নি। তবু আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে আমি রীতিমত বড় হয়েছি, সংসারকে বেশ চিনেছি। চেনারই ত কথা! দুবছর মাথার উপর কেউ কর্ত্তাব্যক্তি ছিলেন না। মনের সাধে কলকাতার পথঘাট চ'ষে বেড়িয়েছি। তার উপর, বিয়ে করেছি, পরীক্ষায় ফেল হয়েছি, দিন দুপুরে রাত দুপুরে ফুটবল খেলেছি, সভা-সমিতিতে মোড়লী করেছি। আর কি রকমে মানুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে?

কর্ত্তৃপক্ষের কিন্তু ধারণা অন্য রকম ছিল। তাঁরা এই নাবালকটির তত্ত্বাবধানের নানা ব্যবস্থা করতে লাগলেন। স্থির হল, অমুক আমাকে বোম্বায়ে জাহাজে তুলে দিয়ে আসবেন, অমুক মার্সেইয়ে নামিয়ে নেবেন। জলপথটাও যে একটু স্বস্তিতে কাটবে তার উপায় এঁরা রাখলেন না। কাপ্তান সাহেবকে আমার অভিভাবক করে ছেড়ে দিলেন। আমি সমুদ্র পার হচ্ছিলাম ফরাসী কোম্পানীর জাহাজে। ওদের ভাষা একটু আধটু বলতে পারতাম ব'লে অফিসার-মণ্ডলীর কাছে আমার আদর খুব বেড়ে গেল। তারা আমার খাবার জায়গা করে দিলে নিজেদের মাঝে, আর এটা খাও ওটা খাও করে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত করতে লাগল। আমার কেবিনে উইলিয়াম্‌স্ নামে এক বুড়ো ইংরেজ ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন। তাঁর পেশা ছিল রাজাদের ঘোড়দৌড়ি আস্তাবলের তদারক করা। আমি কুচবেহারের লোক জেনে তিনি মহাখুসী হয়ে আমাকে বললেন, "তুমি ত আমার আপনার লোক হে! আমি তোমাদের রাজার কত ঘোড়া রেসের জন্য তৈরী ক'রে দিয়েছি।" ফরাসী কাপ্তানকে এই বৃদ্ধ কি বললেন জানি না। কিন্তু এডেন, পোর্ট-সৈয়দ বন্দরে ইনিই আমাকে ডানা ঢাকা দিয়ে বেড়িয়ে নিয়ে এলেন। পাঠককে আগেই বলেছি আমার সহযাত্রী কাপ্তান স্টুয়ার্টের কথা। পোর্ট-সৈয়দ ছাড়বার পর তিনিও আমার একজন অভিভাবক হয়ে দাঁড়ালেন। আমাকে একটু ব'কে ধমকে বললেন, "তুমি বড়লোকের

ছেলে, উইলিয়াম্‌সের সঙ্গে অত মাখামাখি কেন? লোকটা জাতে হুকুম বইত নয়।" ছেলেবেলা থেকে যার হুকুমে ঝি চাকরদের দাদা দিদি ব'লে ডেকে এসেছি, তাতে ত কোন দিন ইজ্জৎ যায় নেই। আজ উইলিয়াম্‌স্ আমার জাত মারবে কি ক'রে!

মার্সেই বন্দর চৌদ্দ দিনের দিন পৌঁছলাম। কাপ্তান পিঠ চাপড়ে বললেন, "তোমার কর্ত্তাদের লিখো যে আমরা তোমাকে খেয়ে ফেলি নেই, ভালয় ভালয় ইউরোপ পৌঁছে দিয়েছি। তাঁরা যেন আমার এজেণ্ট সাহেবকেও জানান।" একটু পরেই দেখি চৌধুরী সাহেব এসেছেন। জাহাজের বন্ধুবান্ধবের কাছে বিদায় নিয়ে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। লণ্ডন পর্য্যন্ত তিনি আমার কর্ণধার।

এইবার একটু বাজে কথা বলব। আমি বিলেত প্রবাসের গল্প গুজব শুনে এক তরুণ বন্ধু সেদিন ঠাট্টা ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের সময়ে বিলেত ছিল নাকি?" প্রশ্নটা নিতান্ত অর্থহীন নয়। তবে, একটা যেমন তেমন বিলেত ছিল বই কি। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। আমাদের সেই সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মযুগের ভাবনা সাধনা যে রকম ছিল, আমাদের বিলেতরূপী সিদ্ধিও তদ্বৎ ছিল। এখনকার বাঙ্গালীর উৎকট সাধনার উপযুক্ত সিদ্ধি এখনকার উগ্র বিলেতী সভ্যতা। এ বিলেত আমাদের হাতে সইত না। হয়ত ভিক্টোরীয় যুগের একজন সেকেলে স্কোয়ার এসে দাঁড়ালে তারও ঠিকে ভুল হয়ে যেত। সকলের কি পেঁয়াজ, রসুন, গরম মশলার গন্ধ বরদাস্ত হয়! তবে একটা কথা বারবার মনে হয়। যে জাত মহাযুদ্ধের সময় চার বছর ধ'রে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা করেছিল, trench-এর (খাদের) পাঁকের মাঝে শুকনো নোনা মাংস খেয়ে দিনের পর দিন কাটিয়েছিল, shrapnel গুলির বর্ষণে কাতারে কাতারে প্রাণ দিয়েছিল, তাদের ঘরে ফিরে এসে, কিছুদিন সকল বাঁধন সকল শাসন কেটে ফেলে দিয়ে, জীবনটাকে আবীর গুলালের রঙ্গে রাঙ্গিয়ে দেওয়ার সাধ হবে বইকি! কিন্তু যারা রণদেবতার তাণ্ডবলীলার সময় লেপ মুড়ি দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে ছিল তাদের যোগ্য কণ্ঠাভরণ লৌহশৃঙ্খল। বসন্তোৎসবের ফুলের মালা তাদের জন্য নয়।

আমি যে ইংলণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হলাম সেখানে বসন্তোৎসবের চিহ্নমাত্র ছিল না। চারিদিকে একটা বিরাট আত্ম-প্রসাদের হাওয়া। কোন রকমের হালকাপণা সে হাওয়ার সঙ্গে খাপ খেত না। লোকে হাসত মুখ টিপে টিপে, নাচত পা ঘসে ঘসে, চলত গজেন্দ্রগমনে। ইংরেজ তখন তার অগাধ ঐশ্বর্য্য নিয়ে, বিশাল সাম্রাজ্য নিয়ে মশগুল। কিসে টাকার থলী আরও ভারী হবে, কিসে রাজ্য আরও বিস্তৃত হবে এই তার ধ্যান। এই যুগের সম্বন্ধেই এক রসিক ফরাসী লেখক ব'লে গেছেন, ইংরেজ-বাপ তার ছেলেকে সংসারযুদ্ধে পাঠাবার সময় আশীর্ব্বাদ করে, "বাপু যাও, টাকা রোজগার কর গিয়ে। পারত সৎপথে থেকে রোজগার কোরো। কিন্তু মনে রেখো, টাকা আনাই চাই।"

মোটের উপর ইংরেজের তখন একটা খুব হামবড়া ভাব। তা, হওয়ার কারণও ছিল। তাদের Free trade (অবাধ বাণিজ্য), Constitutional monarchy (নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র), Public school (ইটন, হ্যারো প্রভৃতি), Varsity (অক্সফোর্ড প্রভৃতি প্রাচীন বিদ্যাপীঠ) জগতের আদর্শ। তাদের বিশাল সাম্রাজ্য কেমন সুশৃঙ্খলায় চলছে। বিদেশীরা দেখুক, শিখুক। যুদ্ধবিগ্রহ অনেকদিন হয় নেই, কিন্তু তাতে কি এসে যায়, ইংলণ্ড সদাই প্রস্তুত! সেই সময়কার একটা গান মনে পড়ছে। কুলী মজুরেও রাস্তায় গাইত।

"We dont want to fight
But, by Jingo, if we do,
We have got the ships,
We have got the men,
We have got the money too."

বড়াই শুনে অদৃষ্ট-দেবতা হয়ত অলক্ষ্যে আকাশের কোণে ব'সে হাসছিলেন। তার পর ক'টা বছরই বা গেছে! এত সাধের Free trade, Constitutional Monarchy, Eton, Harrow, Oxford, Cambridge, আর জগতের চোখে ধাঁধাঁ লাগাতে পারছে না। রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি এখন জগৎকে শিখতে হচ্ছে টিউটন, লাটীন ও স্লাভ জাতের

কাছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ধীরে ধীরে চ'লে যাচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর পারের দুই জাতের হাতে। তারপর, জগৎজোড়া একটা বৃহত্তর ব্রিটেন গ'ড়ে তোলবার প্রচেষ্টা, তাও আজ জেনিভার আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের মহান আদর্শের পাশে একটা অতি ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির পন্থা ব'লে ধরা পড়ে গেছে। যাকগে, এ সব পুরানো কথা নয়, অতএব আমার অধিকারের বহির্ভূত।

চৌধুরী মহাশয়কে পাণ্ডা পেয়ে আমার একটা মস্ত সুবিধা হয়ে গেল। তাড়াহুড়ো করে ইংলণ্ডে যেতে হল না। প্রায় হপ্তাখানেক ধ'রে মার্সেই ও পারিস দেখে গেলাম। আমি অজ-নেটীব ঘরের ছেলে, সাহেবী কায়দা সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। কলকাতায় শেষ কদিন ইংরেজ দরজী, ইংরেজ মুচী ও ইংরেজ নাপিতে মিলে আমাকে কোন রকমে সাহেব সাজিয়ে দিয়েছিল। কাজেই বড় বড় হোটেলে বাধ-বাধ ঠেকত বইকি! তবে মুরুব্বী সঙ্গে। ছোট বড় সমস্যাগুলো তিনিই মিটিয়ে দিতেন।

ডুমাসের Monte Cristo বইখানা আমার বড় ভাল লাগত। দেশে অনেকবার প'ড়ে এসেছিলাম। মার্সেই ঘুরে ঘুরে ঐ কেতাবের জায়গাগুলো খুঁজে বের করতে লাগলাম। আর কিছু দেখতে পেয়েছিলাম কিনা মনে নেই। কিন্তু মার্সেইয়ের জাহাজঘাটা, আর বন্দরের মুখে শাতো দিফের কেল্লা দেখে বড় ফূর্ত্তি হয়েছিল। আনন্দের আতিশয্যে ফরাসী ভাষায় একখানা Monte Cristo অনেক দাম দিয়ে কিনে ফেলেছিলাম। মার্সেইয়ের আর একটা romance আমার মনে গাঁথা ছিল। আমার মাষ্টার ফোশার সাহেব ফরাসী প্রথম ভাগ শেষ করেই আমাকে যত্ন ক'রে La Marseillaise পড়িয়েছিলেন আর এই গান রচনার গল্প বলেছিলেন। যারা এই সহরে এক শতাব্দী আগে প্রথম মার্সেইয়েজ গেয়েছিল, তাদের কথা বারবার মনে পড়তে লাগল যখন পারিসমুখো রওয়ানা হলাম। মনে সুরটা বাজছে। সেই "Allons, enfants de la Patrie"—(স্বদেশ সন্তান চল সবে আজি বিজয়ের অভিযানে)-র তালে আমিও আজ পারিস চলেছি। স্বপ্ন কি সুন্দর জিনিষ!

পারিস পৌঁছে এক মস্ত হোটেলে আমরা উঠলাম। হোটেলে দেখলাম ইংরেজে ভরা। তাদের অনেকে আবার ভারত-ফেরৎ সাহেব মেম। এ বেচারারা আমাদিগকে যে খুব স্নেহ আদরের চোখে দেখছিল তা বোধ হোল না। তবে তারা নিজেরাই বিশেষ সুবিধা করতে পারছিল না। একদিকে চৌধুরী সাহেব বৈঠকী মানুষ, খুব জমিয়ে নিয়েছিলেন সকলের সঙ্গে। তার উপর আবার তাঁর পরিচিত এক ইংরেজ-পরিবার সেখানে ছিলেন তাঁরা সর্ব্বদা আমাদের নিয়েই থাকতেন। এই দলে দুটি খুব সুন্দরী মেয়ে ছিল। সকলের নজর তাদের দিকে, কিন্তু তারা কারও দিকে ফিরে চাইত না। আমার হাতে এক আংটী ছিল। তার উপর লেখা, "Pensez a moi, মনে রেখো।" এক সুন্দরী সেই আংটী নিয়ে আমাকে ক্রমাগত জ্বালাতন করতে লাগলেন, "কে দিয়েছে, বলুন।" শেষে আমি বুঝিয়ে দিলাম যে ওটা আমার রক্ষা কবচ, পরা থাকলে দেবতা বিশেষের বাণ আমার গায়ে লাগবে না। সুন্দরীরা বললেন যে সব চেয়ে ভাল হয় আমার কপালের উপর একটা লাল বাতি জ্বালিয়ে রাখলে, তাহলে কেউ কাছে ঘেঁসবে না। "কোন গুণ নাই তার, কপালে আগুন।" এঁরা আনকোরা এসিয়াটিক ছেলে এই প্রথম দেখলেন। নূতন জীবটির আশা করি দুই একটা গুণও দেখেছিলেন। এ বিষয়ে প্রশ্ন করার সাহস হয় নেই।

পারিসের দ্রষ্টব্য জিনিষ চৌধুরী সাহেব সবই দেখালেন। কিন্তু আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছিল Place de la Bastille। অত্যাচারী বুর্বঁ রাজার সেই বিশাল দুর্গের একখানা পাথরও আজ দাঁড়িয়ে নেই। চৌমাথার উপর ভূঁইয়ে শুধু গোটা কয়েক দাগ আছে। লোকে বলে ঐ দাগের উপর দুর্গের দেওয়াল ছিল। প্রজারা ক্ষেপে উঠে হাতের নখ দিয়ে একখানা একখানা ক'রে দেওয়ালের পাথর ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। ভেরসাই লুভরের রাজবাড়ীও দেখলাম। এই দুই বাড়ীতে আমি পরে এতকাল কাটিয়েছি যে এদের কথা আর একবার ভাল ক'রে বলব। আমার অভিভাবক আমাকে নিয়ে একটু বিব্রত হয়েছিলেন, বোধ হয়। কোথায় পারিসের শোভা দেখে মশগুল হয়ে বেড়াব, না যত সেকালের

প্রেতকে নিয়ে টানাটানি করছি। নিজেরও লজ্জা বোধ হত। কিন্তু কি করব, পারিস ও ফ্রান্স সম্বন্ধে নানা রকম romantic সংস্কার নিয়ে ইয়োরোপে এসেছিলাম।

দিন চারেক বাদ লণ্ডন পৌঁছলাম। ষ্টেশনে ডাক্তার সিংহ নিতে এসেছিলেন। তাঁর হাতে আমায় তুলে দিয়ে চৌধুরী সাহেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাড়ী গেলেন। লণ্ডন ভাল লাগল না। বাড়ীগুলো মনে হল যেন ইংরেজ-চরিত্রেরই অনুরূপ, খুব বড়, ভারী, মজবুত, কিন্তু একেবারে সৌন্দর্য্য-বিহীন, একটুও চটক কি জলুস নেই। তার উপর আবার এপ্রেল মাস। ঝির ঝির ক'রে কেবল বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তায় কাদা। চারিদিক কেমন অন্ধকার মতন, নিরানন্দ। দু চারদিন থাকার পর সূর্য্যের মুখও দেখলাম, Albert Memorial-এর মত সুন্দর বাড়ীও এক আধটা নজরে পড়ল। কিন্তু চার বছরেও কিছুতেই লণ্ডনকে একটু ভালবাসতে পারলাম না। একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য যেন সব সময় এই সহরের মুখটাকে বিকৃত ক'রে রেখেছে। হয় ত পারিস আগে দেখে এসেছিলাম ব'লেই এটা এমন ক'রে মনে ব'সে গেল।

সিংহ সাহেব আমাকে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলেন আমার লণ্ডনের অভিভাবকের বাড়ীতে। তাঁদের সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল না। তাঁরা বিলেতফেরৎ সমাজের লোক। কিন্তু আমাকে এমন আদর যত্ন করলেন যেন আমি তাঁদের চিরদিনের চেনা মানুষ। আমার তখন নূতনের নেশা অনেকটা কেটে গেছে, বাড়ীর জন্য ভয়ানক মন কেমন করছে। মাকে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে এসেছি সে কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। এ সময় মিসেস্ পালিতের মাতৃস্নেহ না পেলে কি হত বলতে পারি না। হয়ত ভারত সরকার একজন অতিযোগ্য সিবিলিয়ান হারাতেন।

বিলেতে এসে আমার একটা মস্ত লাভ হল। আস্তে আস্তে কূপমণ্ডূক ভাবটা কেটে গেল। প্রথম, আমাদের বাঙ্গালী-সাহেব সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল। তাঁরাও যে আমাদেরই মত বাঙ্গালী, ইংরেজী কাপড় পরলেও, ইংরেজীতে কথা কইলেও অন্তরে বাঙ্গালী, এটা বুঝতে পারলাম। তখনকার দিনে বিলেতে সবশুদ্ধ চারশো ভারতীয় লোকের বাস ছিল। তার ভেতরে

অতি অল্পসংখ্যক লোক বিলেতের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছলেন। বাকী সবাই আমাদের মত কাজ উপলক্ষে এসেছিলেন, কাজ হলেই বাড়ী ফিরে যাবেন। এই চারশোর মধ্যে দেড়শো বাঙ্গালী, দেড়শো পারসী আর বাকী একশো অন্য সব জাত মিলিয়ে। মহিলারা অধিকাংশ ইংরেজী ঘাঘরা পরতেন। বিলেতে শাড়ী প'রে বেড়ান তখনও রেওয়াজ হয় নেই। কিন্তু এই গাউন-পরা ইংরেজীভাষী মহিলারা আমাদের ছেলেছোকরার দলের অত্যাচার নীরবে সহ্য করতেন, ঠিক দেশের সেকেলে গিন্নীদের মতন। সেই নিঃশব্দে একশো দেড়শো সিঙ্গাড়া কচুরী ভাজা, সেই প্রসন্ন হাসি সেগুলো ধ্বংস হয়ে গেলে, বিদায়ের সময় সেই সাদর নিমন্ত্রণ, "আবার কবে আসবে সব ?" এঁদের জন্যই ত বিদেশকে বিদেশ ব'লে মনে হত না। বাঙ্গালী অ-বাঙ্গালীর মাঝে তখনও দুর্ভেদ্য প্রাচীর ওঠে নেই। পঞ্জাব-ক্লাব, মাদ্রাজ-ক্লাব, ইত্যাদিও গজায় নেই। কোন কোন পারসী একটু দূরে দূরে থাকতেন বটে, তা নইলে সকলের মধ্যে বেশ একটা আত্মীয়তা ছিল। Superiority complex যে মোটে ছিল না, তা নয়। বাঙ্গালীদের বুদ্ধির ও সাহেবিয়ানার বড়াই, আর পারসীদের রঙ্গের বড়াই কতকটা ছিল বই কি ! সময় সময় "মেড়ো, মেড়ো" শুনে কান ঝালপালাও হয়ে যেত। তবু মোটের উপর বলা যেতে পারে ভেদবুদ্ধি তখনও প্রবল হয় নেই। এমন কি আঞ্জুমান-ই-ইসলামও জাতীয় আদর্শ একেবারে ছাড়ে নেই। অনেকেই নেশনেল লিবারেল ক্লাবে যেতেন। তাঁরা যে খুব প্রখর লিবারেল ছিলেন ব'লে এটা করতেন তা বলা যায় না। ক্লাবটা মোটামুটি সস্তা ছিল, আর সেখানে প্রবেশ-লাভ করাও খুব কঠিন ছিল না। আমার মুরুব্বী লোকেন পালিত মহাশয় ঐখানেই সন্ধ্যাবেলাটা কাটাতেন। আমাকেও দুচার বার বিলিয়ার্ড খেলতে নিয়ে গেছলেন। তবে আমার অত সাহেবসুবো পোষাল না ব'লে নাম লেখালাম না।

আমার কর্ত্তৃপক্ষ ঠিক করেছিলেন যে আমি গণিতের বিখ্যাত অধ্যাপক এডওয়ার্ড্‌সের বাড়ীতে থাকব। কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় শেষ পর্য্যন্ত আমায় নিতে পারলেন না। তাই পালিত সাহেব আমার কলেজে থাকারই ব্যবস্থা করলেন। এর পর থেকে কিছুদিন কলেজের কর্ত্তা রেন সাহেব আমার

অভিভাবক হলেন। তিনি আমাদের খুব কড়া রাশে চালাতেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁকেও ঝেড়ে ফেলে দিলাম। সে পরের কথা। ইতিমধ্যে আমার বোর্ডার-জীবনের দুই একটা গল্প বলি।

তখনকার দিনে ভারতীয় ছাত্রেরা অর্দ্ধেক থাকত আমাদের Bayswater অঞ্চলে, আর অর্দ্ধেক থাকত গাওয়ার ষ্ট্রীটের দিকে। রেনের কলেজটা পাশাপাশি তিনখানা বাড়ী জুড়ে ছিল। সাহেব নিজে পঙ্গু ছিলেন, নড়াচড়া করতে পারতেন না। তাঁর স্ত্রী পরিবার সকাল সন্ধ্যা আমাদের সঙ্গে খেতেন। টিফিনে আসতেন না। দুচার জন বাহিরের ছেলেও আমাদের সঙ্গে টিফিন খেত। রেন পরিবারের একজনের সঙ্গে আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সে তাঁর মেয়ে Dolly ; ডলী বাপের সেক্রেটারী ছিল, আপিসের কাজকর্ম্ম সব ক'রে দিত। কর্ত্তাকে আমাদের কিছু বলবার কইবার থাকলে তাকেই মুরুব্বী পাকড়াতাম। সে হাসমুখী সুন্দরী ছিল, সবাই তাকে ভালবাসত। রেন সাহেব নিজেও খুব ভাল লোক ছিলেন। মন বড় সাদা ছিল। কিন্তু বৃদ্ধের গলা কর্কশ আর কথাবার্ত্তা বড় রূঢ় ছিল। আমাদের মাঝে মাঝে হুজুরে ডাক পড়ত, যেতেও হত, কিন্তু আগ্রহ কারও ছিল না। যে দোর দিয়ে আমরা আপিসে ঢুকতাম সেটা সাহেবের চৌকীর পেছনে ছিল, দোরে টোকা মারলেই যে "Come in" জবাবটা পাওয়া যেত সেটা ঠিক পিস্তলের আওয়াজের মত। কিন্তু ভেতরে যেতেই আগে নজরে পড়ত সেক্রেটারী সুন্দরীর মুখ। সে একটু হেসে, দরকার হলে চোখ টিপে, আসামীকে আশ্বস্ত করত। তারপর কথাবার্ত্তা কতকটা এই রকম চলত। "ডলী, কে এসেছে ?" "মিষ্টার অমুক এসেছেন বাবা।" "সামনে এস। গুড মর্ণিং। দেখি, তোমায় কেন ডেকেছিলাম।" "বোধ হয় ইতিহাসের পরীক্ষার কথা ব'লবে বলে।" "হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস্, ডলী। মনে পড়েছে। তুমি ইতিহাসে মন্দ কর নেই, প্রায় সত্তর নম্বর পেয়েছ। তাই বলে যেন আবার মাথায় হাওয়া ভ'রে না ওঠে। আমি নজর রাখব, বুঝলে ? বেশ ক'রে পড়াশুনো কোরো।"

একদিন হল কি, আমার ডাক পড়াতে আমি গেলাম সাহেবের কাছে। ভেতরে ঢুকে দেখি ডলী নেই। অকূল সমুদ্রে পড়লাম। আস্তে আস্তে

সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমাকে ডেকেছিলেন, মহাশয় ?" "হাঁ, ডেকেছিলাম বইকি। এই নাও।" ব'লে একখানা নিজের ফোটো আমার পানে ছুঁড়ে দিলেন। আমি ছবিখানা হাতে নিয়ে দেখছি, সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, "দেখ বাপু, নিতে ইচ্ছে হয় ত নাও। নইলে ফিরিয়ে দাও।" এর আমি কি জবাব দেব? আস্তে আস্তে বললাম, "আমাকে এটা দিন। বাবার কাছে পাঠিয়ে দেব।" "না, না, তাঁকে আমি পাঠিয়েছি। ওটা তোমার। নিতে চাও ত?" আমি ডান হাত বাড়িয়ে দিলাম, তিনি সেটা ধ'রে খুব ঝাঁকানি দিলেন। ভদ্রলোকের জোয়ান বয়সে নিশ্চয় খুব জোর ছিল। সাহেব আমাকে সত্যি একটু ভালবাসতেন। তবে তিনি যাদু, বাছা বল্‌তে জানতেন না। আর একটা গল্প বলি ওঁর। মাস দুই পরে আমি খবর পেলাম যে আমার মা মারা গেছেন। বিদেশে বিভূঁইয়ে এ রকম খবর পাওয়া কি ভয়ানক তা সবাই বুঝবেন। তার উপর আরও মন খারাপ হল এই ভেবে যে, সামান্য যে অশৌচ পালন, সেটাও করতে পারব না। ভেবে চিন্তে কদিন শুধু রুটি মাখন খেয়ে রইলাম। মনকে বোঝালাম, যতটুকু পারা যায় সেই ভাল। কলেজে কাউকে কিছু বললাম না। পরের মেলে রেণ সাহেব বাবার চিঠি পেয়ে আমায় ডেকে পাঠালেন। আমি যেতেই খুব কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন "আমায় বল নেই কেন? আমাকে সব কথা জানান তোমার কর্ত্তব্য, তা জান না? এখানে তোমার জন্য ত আমি দায়ী।" আমি চুপ ক'রে রইলাম। সাহেব ধমকে উঠলেন, "তুমি নিতান্ত বুদ্ধিহীন। এই ঠাণ্ডা দেশে নিরামিষ খাওয়া চলবে না। শরীরের পক্ষে খারাপ।" আমি ধীরে ধীরে বললাম, "আর তিনদিন মাত্র বাকী, মহাশয়। এর মধ্যে আর মাংস খেতে বলবেন না।" সাহেব আমার পিঠে হাত রেখে ভারী গলায় বললেন, "It is hard lines on you, boy।" ব'লে চশমা মুছতে মুছতে অন্য দিকে মুখ ফেরালেন। আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলাম। পরের তিন দিন আমার জন্য অজস্র দামী ফল ও ক্রীম এল। বুঝলাম কার হুকুমে এসেছে।

পাঠককে ত আগেই জানিয়েছি আমার পল্‌টনে কাজ করার কি রকম সাধ ছিল। বিলেত পৌঁছানর কিছুদিন পরেই সব কাগজে বের হল যে

ব্রেজিলের সুরেশ বাবু মারা গেছেন। ও দিক ত বন্ধ হল। এখন কি করা যায়? একদিন কপাল ঠুকে রেন সাহেবকে আমার দুঃখের কথা জানালাম। তিনি বললেন, "তাতে কি হয়েছে? তুমি army পরীক্ষা দাও। তাহলে আমাদের ফৌজেই চাকরী পাবে। আমি আজই ব্যবস্থা করছি।" আমার প্রাণে আশা হল। কিন্তু আশায় ছাই পড়তেও দেরী হল না। সাতদিন পরে রেন সাহেব আমাকে ডেকে, অনেক দুঃখ করে দরদ দেখিয়ে বললেন, তোমার হুকুম এসেছে। তুমি Army পরীক্ষায় বসতে পার। কিন্তু first (সকলের উপর) হলেও জঙ্গী কলেজে ঢুকতে পাবে না। তোমার জন্য আমার বড় দুঃখ হচ্ছে।" তারপর একটু গরম হয়ে উঠলেন, "এসব ঐ হতভাগা Toryদের চালাকী। ওদের মত সঙ্কীর্ণ মন নিয়ে কি আর এত বড় বাদশাহী চালান যায়।" বলতে ভুলে গেছি যে রেন একজন গোঁড়া Radical ছিলেন। ব্রেজিল গেল, স্যাণ্ডহর্ষ্ট গেল, এখন আমি করি কি? দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হবে। ভলান্টিয়ার হওয়া যাক। কিন্তু সে পথেও দেখলাম অনেক বাধা। আমার স্যাণ্ডহর্ষ্ট যাওয়ার চেষ্টাতে লোকেন বাবু সায় দেন নাই। কিন্তু ভলান্টিয়ারী করার বিষয়ে তাঁর খুব উৎসাহ দেখলাম। তিনি নিজেও আমার সঙ্গে বন্দুক কাঁধে করবেন বললেন। অনেক খোজ খবর নিয়ে Honourable Artillery Company বলে এক নামজাদা অভিজাত পলটনে নাম দাখিল করার জন্য দরখাস্ত করা হল। স্বয়ং যুবরাজ এই পল্‌টনের কর্ণেল আর এদের উর্দ্দী অতি চমৎকার। আমাদের দরখাস্ত গ্রাহ্য হল। লোকেন বাবু রীতিমত গোলন্দাজ হয়ে গেলেন, কিন্তু আমার কিছুই হল না। তিন কেতা উর্দ্দীর দাম ও চাঁদা বাবদ প্রায় দেড়শো পাউণ্ড চেয়ে বসল। অত টাকা আমি কোথায় পাব? বাড়ীতে চেয়ে পাঠালাম কিন্তু গরীবের দুঃখ কেউ বুঝলেন না। আমার যুদ্ধ করা হয়ে গেল। ভাল মানুষের মত ব্যারিষ্টারী আড্‌ডায় নাম লেখালাম।

নাম লেখালাম বটে, কিন্তু প্রাণপণে বিদ্যাচর্চ্চা করতে লেগে গেলাম বললে মিথ্যা কথা হবে। আমার এত রকম ধান্দা ছিল যে বিদ্যাচর্চ্চার জন্য খুব বেশী সময় পেতাম না। সে সব কথা ক্রমশঃ জাহির করব।

আপাততঃ অন্য একটা গল্প করি। সে সময়কার আবহাওয়া সম্বন্ধে পাঠকের ধারণা আরও পরিষ্কার হবে। কলেজে আমার ম্যাক্ বলে এক বন্ধু ছিল। সে এবার্ডীন হতে দর্শনশাস্ত্রে এম, এ, পাশ ক'রে এসেছিল। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, প্রাণে রস-কস বিন্দুমাত্র ছিল না। একদিন ম্যাকের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি। ভদ্রপল্লী ছেড়ে Portobello Road বলে এক বস্তীর মত মহল্লায় গিয়ে পড়েছি। সেখানে কুলীমজুরের বাস। সন্ধ্যা হয়ে আসছে তারা সব মেয়ে ছেলে নিয়ে ফুটপাথে পায়চারী করছে। নানা রকমের ফেরীওয়ালা চারিদিকে ভিড় ক'রে রয়েছে। আমার কাছে এ পাড়াটা একেবারে নূতন, তাই ঘুরে ফিরে সব দেখছি। এমন সময় একটু দূরে একটা "shame, shame !" রব উঠল। চেয়ে দেখি একটি ভদ্র-লোকের মেয়ে, বছর পঁচিশেক বয়স হবে, নিকার-বকার পেণ্টুলেন প'রে বাইসিকেল চ'ড়ে যাচ্ছে, আর দুধারি লোক তাকে দুয়ো দিচ্ছে। ম্যাকও দেখলে। দেখে ঘৃণাভরে ব'লে উঠল, "shameless hussy, বেহায়া ছুঁড়ী !" মেয়েটি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল এই ছোট-লোকের ভিড় থেকে। ম্যাকের স্কচ্ রক্ত গরম হয়ে উঠল, আমাকে বললে, "come, let us hoot her, mon—এস, ওকে খুব দুয়ো দেওয়া যাক।" ব'লে খুব উৎসাহে হাততালি দিয়ে উঠল। আমি তাকে জোরে এক হেঁচকা মেরে টেনে নিয়ে বাড়ীর দিকে ফিরলাম। পথে তাকে বললাম, "ম্যাক, তুই ভদ্রঘরের ছেলে, ধার্ম্মিক লোক, একি ব্যবহার তোর ?" মেয়েটার উপর ম্যাকের রাগ তখনও যায় নেই। সে চেঁচিয়ে উঠল, "এই সব নির্লজ্জ ছুঁড়ীদের প্রশ্রয় দিলে ধর্ম্মই বা থাকবে কোথায়, ভদ্রঘরই বা থাকবে কি ক'রে ? ভেবে দেখ, এরাই ভবিষ্যৎ বৃটনের মাতৃকুল !" এই রকম কত কি বক্তৃতা করলে। আমি নির্ব্বাক হয়ে গেলাম। দেশ ছেড়ে এসেছি বটে, কিন্তু পবিত্র সনাতনী ভাব এখানেও ধাওয়া করেছে। বাস্তবিক, ইংলণ্ডের লোকের মনে তখনকার দিনে একটা মস্ত সমস্যা ছিল যে স্ত্রীলোকের ঘাঘরা কত লম্বা হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে অনেক গান ছড়া মনে আসছে, বাহুল্য ভয়ে পাঠককে উপহার দিতে পারছি না। বেচারা ম্যাক্ এখনও বেঁচে আছে কিনা জানি না। থাকে ত তার মেয়েদের আজানুলম্বিত গাউন

দেখে কত না মনে কষ্ট পাচ্চে। তারপর ভেবে দেখুন, আমাদের কালে বিলেতে মেয়ে পুরুষ এক ঘাটে কখনও স্নান করত না। যারা খুব রসিক পুরুষ, তারা তাই স্নান করতে Trouville যেত। আজ সে সব গোলযোগ নেই। ম্যাকের মেয়েরা হয়ত স্নানের পোষাক প'রে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বালির উপর টিফিন খাচ্চে। একটা কথা বলি—কেউ রাগ করবেন না। উনিশ শতকের ইংরেজ মেয়েরা কাপড় পড়ত অঙ্গ, শুধু অঙ্গ নয় অঙ্গের গড়ন পর্য্যন্ত ঢাকবার জন্য। সে বিদ্যাটা তারা খুব রপ্ত করেছিল। সেই গোড়ালী পর্য্যন্ত লম্বা বেঢপ ঘাঘরা, আর গায়ে একটা ততোধিক বেঢপ লম্বা কোট, এ পড়লে সব মেয়ে মানুষকেই Mrs Grundy-র মতন দেখাত। আর আজ, আমাদের এই সভ্য ভব্য Grundy মেম সাহেবটি গেলেন কোথায় ? না, তিনিও খাটো চুল কেটে খাটো পোষাক প'রে অঙ্গের অনুপম গঠন দেখাবার জন্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেড়াচ্চেন ?

আমাদের কলেজে কড়া নিয়ম ছিল, রাত নটার ভেতর বাড়ী ফিরতে হবে। নটার সময় রোজ ভেতর থেকে দোরে খিল পড়ত। কেউ ঘণ্টা বাজালে, বুড়ো খানসামা হোপ দোর খুলে দিত। দিয়ে গম্ভীরভাবে বলত, "মশায়, কাল আপনার নামে রিপোর্ট করা আমার কর্ত্তব্য, তা আপনি জানেন।" অধিকাংশ সময় কিন্তু রিপোর্ট করাটা হয়ে উঠত না। হোপ বুড়োর এই থেকে একটা বাঁধা আয় ছিল। তবু মাঝে মাঝে সে বেঁকে দাঁড়াত, আর অধর্ম্ম করবে না। তখন কিছুদিন আমাদের গবাক্ষপথে প্রবেশের ব্যবস্থা রাখতে হত। হোপ লোকটা বড় ভাল ছিল। দিনের বেলায় খুব গম্ভীর গজেন্দ্র গমনে চলাফেরা করত। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় যখন দোর খুলে দিতে আসত. তখন মুখে বেশ একটা রঙ্গীন ভাব দেখা যেত। এমন কি, কখন কখন দাঁড়িয়ে দু পাঁচ মিনিট হালকা খোসগল্পও করত। আগেই বলেছি Wren গিন্নী আমাদের সঙ্গে টিফিন খেতেন না। টিফিন ব্যাপারটার অধ্যক্ষ ছিল মিষ্টার হোপ। তার "Luncheon is on the table, young gentleman" বলার কায়দা কি ! আমরাও যথাসম্ভব তার মর্য্যাদা রক্ষা করতাম। টেবিলে বেশী গোলমাল করতাম না। কিন্তু একবার হল কি, দিন কয়েক ধ'রে বড় খারাপ মাংস টিফিনের টেবিলে

আসতে আরম্ভ হল। হোপকে বারবার বলেও কোন ফল হল না। শেষে একদিন আমাদের দলের চাঁই M. তার মাংসের প্লেটটা তুলে নিয়ে জানালা পর্য্যন্ত কাওয়াজ ক'রে, "Here goes", ব'লে বাহিরে ফেলে দিলে ছুঁড়ে। আমরা বাকী সবাই দাঁড়িয়ে উঠলাম, হুররে, ব'লে! হোপের মুখে কথা সরল না। দুবার তিনবার Sir, Sir, ক'রে বুড়ো বেচারা কেঁদে ফেললে। কত বড় বড় ঘরে কাজ করেছে সে। এ রকম অপমান তার স্বপ্নের অগোচর। কিন্তু জগতের গতিই ত এই। অত্যাচার অবিচার তিলে তিলে জ'মে যখন একেবারে অসহ্য হয়ে ওঠে তখন মানুষ ভব্যতার মুখোস খুলে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে দাঁড়ায় প্রতিবিধানের জন্য। M.এর অসমসাহসিক কাজের ফলে কেলেঙ্কার হল অশেষ রকমের। প্রথম, আমাদের সবাইকে গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে টিফিন খেতে হল বাহিরে। দ্বিতীয়, হোপ চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে এক চিঠি লিখলে মনিবকে। তৃতীয়, চায়ের পর আমাদের সবায়ের ডাক পড়ল বড় সাহেবের কামরায়। রোষ্ট মাংসের চাঙ্গড়াটা আনা হল সেইখানে। M. রেন সাহেবকে সেটা দেখিয়ে একটা ছোটখাটো বক্তৃতা করলে। বক্তৃতার শেষ বাক্য, "The article is more useful as a geological specimen than as human food." সাহেব কোন রকমে হাসি থামিয়ে বললেন, "Shut up. Go away, you greedy fellows." এর পর থেকে কিন্তু টিফিনে মাংস খুব ভাল আসতে লাগল। আমরা চাঁদা করে হোপকে এক গিনি বকশিশ করাতে সে ইস্তফা পত্র ফিরিয়ে নিলে। গোল মিটে গেল, তবে Wren গিন্নী দিন দুই তিন খুব মুখভার ক'রে রইলেন। ডলী আমাদের খুব ধমকালে, "তোমরা মাকে না বলে হোপের উপর জুলুম করতে গেলে কেন?" M ছোকরাটা বড় জ্যাঠা ছিল—সে বলে উঠল, "সুন্দরী, তোমার চরণে আমরা সবাই হেঁট মাথা হয়ে মাপ চাচ্ছি।" অনেক বছর পরে এই M-কে বেঁটে মোটা, গালফুলো, কমিশনার সাহেবরূপে দেখে সমস্ত গল্পটা মনে পড়ে গেছল। অনেক কষ্টে হাসি চেপেছিলাম।

আমি লণ্ডনে গিয়েই কলেজে বোর্ডার হয়ে গেলাম ব'লে স্বদেশী বন্ধুবান্ধব হতে একটু দেরী হল। পালিত, চৌধুরী, সিংহ সাহেব প্রভৃতি

...লোকের সঙ্গে প্রথমেই আলাপ হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁদের কাছে ...ঘেঁসতে সঙ্কোচ হত। অবশ্য মিসেস পালিতের কাছে লুচী পোলাও ...সময় পেলেই দৌড়তাম। আমার এক বাল্যবন্ধু শীল মেডা ভেলে এক ...পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। তাঁরা ধর্ম্মে ক্যাথলিক ছিলেন আর ...য়োরোপের অন্যান্য ক্যাথলিক জাতের মত খুব মিশুক ছিলেন। তাঁদের বাড়ী বহুকাল পর্য্যন্ত ফি শনিবারেই যেতাম। গেলে বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসতাম। গিন্নী প্রথম দিনই ব'লে দিয়েছিলেন, "এ তোমার বন্ধুর বাড়ী। এখানে ঘরের ছেলের মত যাওয়া আসা করবে।" এক রকম ঘরের ছেলের মতনই হয়ে গেছলাম। এঁদের বাড়ীতে বিলিয়ার্ড টেবিল ছিল, আর বেশ একটি বাগান ছিল। কাজেই সময় সহজেই কেটে যেত। অন্য পাঁচজন ভদ্রলোকের যাওয়া আসাও ছিল। কখন কখন বাগানে চা-পার্টি হত। এখানে নিয়মিত এসে ইংরেজ ভদ্রসমাজে মেশা অভ্যাস হয়ে গেল। নইলে প্রথম প্রথম লজ্জা করত বই কি! আমাদের ছাত্রমণ্ডলীর মুস্কিলই ত ছিল ঐখানে। অনেকে Miss Manningএর বিখ্যাত N. I. A.'র সান্ধ্য সম্মিলনীতে যেত। সেখানে যত হোমরা চোমরা ভারত ফেরত ইংরেজ জমা হতেন আর প্রাণ ভ'রে তাদের পিঠ চাপড়াতেন। বন্ধু শীলের বাড়ীতে সুবিধা এই ছিল যে কালা আদমী বলে কেউ হেনস্তাও করত না, পিঠও চাপড়াত না।

অল্পদিনের মধ্যে Summer (গ্রীষ্ম) এল। এই Summer-ই এদের যথার্থ মধুঋতু। Spring-এর চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর। আকাশ পরিষ্কার। চারিদিকে যেন ফুলের মেলা লেগেছে। পার্কে, বাগানে, সর্ব্বত্র দলে দলে লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সকলের মুখে হাসি। দীর্ঘ বেলা, সাড়ে আটটা ...টা পর্য্যন্ত বাহিরে আলো। দৈনিক কাজ কর্ম্ম সেরে মানুষ অনেকক্ষণ আমোদ আহ্লাদ ক'রে ঘুরে বেড়াতে পারে। এই তিনমাসের ইংরেজ, আর বাকী ন মাসের ইংরেজে অনেক তফাৎ। তবে এ সব সেকালের কথা। তখনও ইংরেজী সমাজ neurosis-এর উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নেই। তখন এদের ধাত ছিল phlegmatic (কফপ্রধান)। বায়ুর প্রকোপ ছিল না।

আমাদের কলেজ তিন হপ্তার জন্য বন্ধ হল। আমি পাড়া গেঁয়ে ছেলে। বিলেতের পাড়াগাঁ দেখার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছিলাম। রেন সাহেব আমাকে ব্যবস্থা ক'রে পাঠিয়ে দিলেন টেম্‌স্ পারে গোরিং ব'লে এক গ্রামে। সেখানে পেনী নামে এক farmer (কৃষক) ছিল। সে গোঁড়া লিবারেল ছিল তাই রেন তাকে বড় শ্রদ্ধা করতেন। তার বাড়ী তিন হপ্তা থাকব ঠিক হল। আমার বিলেত সম্বন্ধে জ্ঞান এত কম ছিল যে ফার্ষ্টকেলাসের টিকিট কিনে রওয়ানা হলাম। ঐ পথেই উইণ্ডসারের রাজবাড়ী। কাজেই গার্ড সাহেব ধ'রে নিলেন যে আমি সাম্রাজ্ঞী সন্দর্শনে যাচ্ছি। আমি বুঝিয়ে বললাম কোথায় যাচ্ছি। তবু সেলামের ঠেলায় অস্থির হয়ে উঠতে হল আর বকশীশ বাবৎ মব্‌লক পয়সা বেরিয়ে গেল। গোরিং ষ্টেশন পৌঁছতেই গার্ড স্বয়ং জিনিষ পত্র নামিয়ে দিয়ে ষ্টেশন-বাবুকে ব'লে দিলে, "ইনি পেনীর ফার্মে (খামারে) যাবেন। গাড়ী ডাকিয়ে পাঠিয়ে দিন।" গাড়ী কোথায় পাবে বেচারা! ট্রেন বেরিয়ে গেলে বললে, "আপনি একটু বসুন, আমি ফার্ম থেকে গাড়ী আনাচ্ছি।" এমন সময় আমি দেখলাম যে এক টাকমাথা টুকটুকে লাল মুখ, সাদা দাড়ী, গোঁপ কামান, বুড়ো দাঁড়িয়ে রয়েছে টিকিট ঘরের কাছে। আমাদের হোপের মত দেখতে, শুধু পোষাক আলাদা। পায়ে গেটার, গায়ে চৌখুপী কম্বুলে কাপড়ের লম্বা কোট, টুপীটা হাতে নিয়ে ঘোরাচ্ছে। আমি এগিয়ে গিয়ে ভরসা ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি ফার্মার পেনী, না? গুড মর্ণিং, আমি এসেছি।" বুড়ো আমার হাতটাকে খুব নাড়া দিয়ে বললে, "আপনি মিষ্টার রেনের বিদেশী বন্ধু, না? আসতে আজ্ঞা হোক।" মুটের মাথায় জিনিষ তুলে দিয়ে চললাম ফার্মের পথে।

ফার্ম দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। এর নাম চাষার খামার বাড়ী! ফটক থেকে বাড়ী পর্য্যন্ত লাল কাঁকরের রাস্তা, দুধারে আপেল বাগান। বাড়ীটি ঝকঝকে নূতন, পেনী নিজে মজুর লাগিয়ে তৈরী করেছে। ঢুকেই ডান দিকে আমার বসবার ঘর! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাবুলোকের ব্যবহারের উপযোগী আসবাব পত্র দিয়ে সাজান। বাঁ দিকে রান্নাঘর। পেনী-পরিবার সেইখানে খাওয়া দাওয়া করে। রান্নার চুলো, বাসন-

বাসন, টেবিল-তাক, সব তকতক করছে। আমাদের হিঁদু বাড়ীর রান্নাঘরও এককালে এই রকম ঝকঝকে পরিষ্কার ছিল। এখন আর নেই। সে কথা যাক। পেনীর রান্নাঘরের অধিষ্ঠাত্রী বেরিয়ে এলেন মেয়েদুটিকে নিয়ে। তিনজনেই অতিথিকে খাতির করবার জন্য পরিষ্কার ছিটের গাউন প'রে রয়েছেন। গিন্নী আমাকে অভ্যর্থনা ক'রে বললেন, "আপনি আসবেন শুনে আমাদের বড় আনন্দ হয়েছিল। আমরা কখনও বিদেশী ভদ্রলোক দেখি নেই। যা দরকার, চেয়ে চিন্তে নেবেন।" মেয়েরা বললে, "আপনার জন্য আমরা কেক তৈরী করছিলাম। আপনি কেক খান ত?" দেখলাম এরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না যে আমি সাধারণ ইংরেজ ছেলের মতই খাই দাই থাকি। যতটা পারি অভয় দিলাম। আমার শোবার ঘর দোতলায়। সে ঘরেরও সাজসজ্জা দেখলাম সাদা-সিধে কিন্তু পরিষ্কার। তারপর মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে সমস্ত ফার্ম দেখে এলাম। তখন ক্ষেতে কিছু শস্য ছিল না বটে, কিন্তু ফলবাগান ফলে ভরা। বড় বড় গরু রয়েছে গোয়ালে। অজস্র হাঁস মুরগী পেরু। কিন্তু সব চেয়ে তোয়াজ দেখলাম শূয়োরের। সে শূয়োরের সঙ্গে আমাদের দেশের ঐ নামের নোঙ্গরা জন্তুগুলোর তুলনাই হয় না। এদের শূয়োর-গুলো যেন মোটা মোটা প্রকাণ্ড খরগোস। নানারকম রঙ্গের, আর কি পরিষ্কার! আমাদের গরুর গাও এত পরিষ্কার নয়। ব'সে ব'সে বিট, গাজর, শালগম, এই সব খাচ্ছে। মেয়েরা বড়াই ক'রে বললে, "আমাদের ফার্মের হ্যাম বেকন খেয়ে দেখবেন। এ রকম লণ্ডনেও পাওয়া যায় না।" সব ঘুরে ফিরে এসে সেদিন পেনীগিন্নীর কাছে চা খেলাম। মা মেয়েরা তিনজনেই চমৎকার সরল, যেমন চাষার মেয়ে সব দেশেই হয়। চকোলেট কেকটা সাদা সিধে কিন্তু সুন্দর লাগল। Home-made কেকের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। সন্ধ্যার সময় পেনীর ছেলে এল। সে বিয়ে-থা ক'রে গাঁয়ে মুদীর দোকান করেছে। দোকান-ঘরের দোতলায় থাকে। বাপ মার সঙ্গে খুব ভাব। তবু আলাদা থাকে কেন তখন বুঝতে পারি নেই। ক্রমশঃ জানলাম এই ও দেশের প্রথা। প্রথাটা নিতান্ত মন্দ নয়। গোরিং গাঁটি খুব ছোট। তবে ইস্কুল আছে, গির্জ্জা আছে, ডাকঘর

আছে। ডাকঘরের আলাদা বাড়ী নেই। এক মেঠাইয়ের দোকানে ডাক-আফিস, আর সেই দোকানওয়ালী ডাক-মাষ্টার।

পরদিন আমার এক বন্ধু লণ্ডন থেকে এলেন। দুজনে গ্রামে গিয়ে ক্রিকেট খেলার বন্দোবস্ত করে এলাম। চারিদিকের ফার্মের মজুর ছোকরারা গাঁয়ের গোচারণ মাঠের এক কোণে খেলত। তাদের খেলার সরঞ্জাম একটু মেঠো রকমের ছিল। আমরা এই ছোকরাদের সঙ্গে ভাব ক'রে নিয়ে রেডিং থেকে নূতন জিনিস পত্র আনালাম। যতদিন ছিলাম এদের সঙ্গে প্রায় রোজ খেলতাম। খেলার প্রয়োজনও যথেষ্ট ছিল। ফার্মের তৈরী হ্যাম বেকন, তাজা ডিম, তাজা মাখন ক্রিম, সামনে পেয়ে লোভ সংবরণ করা সম্ভব ছিল না। কাজেই একটু ব্যায়াম না হলে চলে কি ক'রে! আমরা ডাকঘর থেকে এক এক ঠোঙ্গা মেঠাই কিনে রোজ গ্রাম প্রদক্ষিণ করতাম, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ভাব করার জন্য। দু'চার দিনেই তাদের সঙ্গে খুব আলাপ জমে গেল। আর এক নিয়ম আমরা করেছিলাম। গ্রামের থেকে কাউকে না কাউকে রোজ ডিনার খেতে বলতাম। স্ত্রীলোক কেউ এলে মিসেস পেনীও বসতেন। কিন্তু প্রধানতঃ পুরুষরাই আসত। এই রকমে চাষা, কারিগর, দোকানদার সকলের সঙ্গেই কতকটা ঘনিষ্ঠতা হল। একদিন আমাদের ফার্মার পেনীও খেলেন। এমনি ত আমরা প্রায়ই রান্নাঘরে টিফিন খেতাম। তখন পেনীরা নিত্যকার পোষাকেই বসতেন। কিন্তু মিঃ পেনী যেদিন খানা খেতে এলেন সেদিন লম্বা কালো কোট, শক্ত খাড়া কলার, কালো বার্ণিসকরা জুতো এই সব পরেছিলেন। বোধ হয় ভদ্রলোকের বিয়ের সময়কার কাপড়, গায়ে বড্ড আঁট হয়ে বসেছিল। নিশ্চয় কষ্ট হচ্ছিল। কেন না, খাওয়ার পর খাঁ করে বেরিয়ে গিয়ে কাপড় বদলে রোজকার Corduroy পরে এসে, তবে সুস্থির হয়ে পাইপ ধরিয়ে বসলেন। গল্প করতে করতে যখন শুনলেন যে আমি বাঙ্গালী হিন্দু, তখন বললেন, "তাহলে ত আপনার একটা জিনিষ দেখা উচিত। এখান থেকে পাঁচ কোশ দূরে এক বড় ইঁদারা আছে। তার নাম Rajah's Well। বাঙ্গালা দেশের রাজা সেই ইঁদারা ক'রে দিয়েছেন।" আমরা বললাম, "চলুন না কাল যাওয়া যাক সেখানে।"

পরদিন গেলাম সেই কুয়ো দেখতে। পেনী গিন্নী নোনা শূকর মাংস, রুটি, মাখন, পনীর, বেঁধে দিলেন সঙ্গে। ফার্মার বলেছিল পাঁচ কোশ পথ। কিন্তু বার তের মাইলের এক হাত কম হবে না। চাষাদের কোশ-জ্ঞান দেখছি সব দেশেই এক রকম। যাইহোক, বুড়ো চলল কিন্তু সমানে আমাদের সঙ্গে। বেলা বারটায় আমাদের গন্তব্য গ্রামে পৌছলাম। খোঁজ নিয়ে কুয়োর কাছে গেলাম। দেখি সে এক বিরাট ব্যাপার। চূড়াওয়ালা সুন্দর হাওয়া-খানা। তার ভেতর বসবার বেঞ্চিপাতা। মাঝখানে এক গভীর ইঁদারা। শ্বেত পাথরের ফলকে লেখা রয়েছে যে কাশীনরেশ ঈশ্বরীপ্রসাদ এই ইঁদারা বেঁধে দিয়েছেন। চৌকীদার এলে তার কাছ থেকে এক ছোট বই ও গোটাকয়েক মেডেল কিনলাম। বই থেকে ইতিহাস জানা গেল। এই গ্রামের এক সাহেব সিপাহীবিদ্রোহের সময় মহারাজের কিছু উপকার করেছিলেন। মহারাজ পুরস্কার দিতে গেলেন কিন্তু ভদ্রলোক নিলেন না। অনেক পীড়াপীড়ির পর এতদূর রাজী হলেন যে পরে তাঁর কিছু অভাব হলে জানাবেন। কিছুকাল পরে নিজ গ্রামে ফিরে ভদ্রলোক দেখলেন যে সেখানে বড় জলকষ্ট। মহারাজকে জানালেন। তিনি অনেক খরচ পত্র ক'রে, তাঁর কৃতজ্ঞতার নিদর্শন, এই ইঁদারা ক'রে দিলেন। আমরা বেঞ্চে ব'সে ভোজন সেরে নিলাম। জল বড় মিষ্টি লাগল। লাগারই কথা। ও জলের সঙ্গে যে ভারতের হৃদয়ের যোগ আছে!

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

ইতিহাস

(৩)

আমি ইতিপূর্ব্বে বরাবর 'শ্রেণী-বিরোধ' কথাটি ব্যবহার করেছি। এই অধ্যায়ে আমি 'শ্রেণী'র তাৎপর্য্য বোঝাতে চেষ্টা করব। ন্যায়-শাস্ত্রের সংজ্ঞাস্থাপন এক্ষেত্রে অসম্ভব ; কারণ ইতিহাসের পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা এবং অন্য প্রত্যয় থেকে শ্রেণী-প্রত্যয়কে বিযুক্ত করা যায় না। ইতিহাসের সংজ্ঞা ন্যায়শাস্ত্রের সংজ্ঞা নয়। ইতিহাসের প্রত্যয় কর্ম্মের পন্থা নির্দ্দেশ করে।

সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানেই প্রত্যয়ের আবশ্যক। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলি ছিন্নভিন্ন অবস্থায় উপস্থিত হয়, একের সঙ্গে অন্যের যোগ হয়ত থাকে না, থাকলেও সে যোগটি পরিষ্কার নয়। জ্ঞানের দিক থেকে অথচ অভিজ্ঞতাগুলিকে যুক্তভাবে দেখবার একটা তাগিদ থাকে। প্রত্যয়ের দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন হয়। একবার গ্রথিত ও সমন্বিত হলে সেই প্রত্যয়েরই সাহায্যে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত ও নূতনতর হয়। প্রত্যয়ের সাহায্যে সেই প্রকারের অভিজ্ঞতার গভীরতর সমালোচনা সম্ভব হয়। এই উপায়ে একজনের জ্ঞান সর্ব্বসাধারণে ভোগ করতে পারে। প্রত্যয় হল সমন্বয়-জ্ঞানের ভাষা, এবং ভাষার ওপর কারুর একচেটিয়া অধিকার নেই। প্রত্যয়ের অন্য প্রকৃতি হল বেষ্টনীর সঙ্গে জ্ঞানীর ও পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানের সমাযোগ-সাধন। জ্ঞানীর ও জ্ঞানের মধ্যে চিরকালই যে বৈরীভাব থাকে তা নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু জোর করে বলবার দরকার রয়েছে যে বৈরীভাব না দূর করলে জ্ঞানবৃদ্ধিও হয়না, জ্ঞানীও সে জ্ঞানের সাহায্যে সম্পূর্ণ হন না, শান্তিও পান না। একমাত্র প্রত্যয়ের দ্বারাই বৈরীভাব দূরিত হয়ে জ্ঞানবৃদ্ধি ও সম্পূর্ণতা-স্থাপন সম্ভব হয়ে ওঠে। অভিযোজন-কার্য্যের ফলে পূর্ব্বদৃষ্টি আসে। পূর্ব্ববোধের সাহায্যে ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতাকে সজ্জিত ও নিয়ন্ত্রিত করা যদি বিশদ-জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তাহলে প্রত্যয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি কোন জ্ঞানই কখনও পাবে না।

ইতিহাসও পাবে না। ব্যক্তির দিক থেকে বলা চলে যে ইতিহাসের ব্যাপকতর প্রত্যয়ের সাহায্যে অতীত, বর্ত্তমান, এমন কি ভবিষ্যৎ

অভিজ্ঞতা সুব্যবস্থিত হয়ে ব্যক্তিকে সুসম্পূর্ণ করে। এই হিসাবেই ঐতিহাসিকের দৃষ্টি প্রকৃত দর্শন। কোন জ্ঞানকে বিজ্ঞানের স্তরে তুলতে গেলে প্রত্যয়ের প্রয়োজন আরো বেশী করে অনুভব করতে হয়, এমন কি গোটাকয়েক নতুন রকমের প্রত্যয়ের প্রয়োজন হয়। আমাদের আলোচ্য-জ্ঞান হল ইতিহাস, যার বিষয় হল সামাজিক অভিজ্ঞতার ধারা। সে ধারার রীতিনীতি আছেই আছে, কেননা অভিজ্ঞতা একপক্ষে মানুষেরই, এবং মানুষের কার্য্যাবলী পূরোপূরি এলোমেলো কি অগোছাল নয়। অন্যপক্ষে বহিঃপ্রকৃতির ঘাতপ্রতিঘাত রয়েছে। বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদে বহিঃপ্রকৃতির নিয়মাবলী মানব-প্রকৃতির নিয়মাবলী অপেক্ষা সুসম্বদ্ধ ও সুনির্দ্দিষ্ট। অর্থাৎ ইতিহাসের বিষয়-বস্তুর উপাদানগুলির একাংশ অন্যাংশের চেয়ে বিজ্ঞানাধীন। বহিঃপ্রকৃতির কোন বিশেষ ঘটনাকে ঘটনা-পারম্পর্য্য থেকে যূথভ্রষ্ট করা চলে, নিরালম্ব করা যায়, করলে বৈজ্ঞানিকের কোন সামাজিক ক্ষতি হয় না ; কিন্তু মানবপ্রকৃতির বিশেষ কোন অভিজ্ঞতাকে ধারাবাহিকতা থেকে মুক্ত করা চলেই না, কারণ এই ধারাবাহিকতা যান্ত্রিক অনুক্রম নয়, পূর্ব্ব ও পরের অন্বয় ; এবং বিচ্ছিন্ন করলে মানুষের সামাজিক ক্ষতি হয়। অন্যান্য কারণের মধ্যে এই দুই কারণে বাইরের ঘটনাকে পরীক্ষাগারে পুনর্গঠিত করা চলে, এবং অন্তরের ঘটনা-সমাবেশ নিরুপম থেকেই যায়। (অবশ্য সবই আপেক্ষিকভাবে।) সংখ্যা শ্রেণীর একটি সাধারণ গুণ, এবং তার অন্য সাধারণ গুণ সম্ভব হয় একটি বিশেষ গুণের পুনরাবৃত্তির দরুণ। (এখানে শ্রেণী অর্থে অঙ্কশাস্ত্রের 'ক্লাশ' বলছি।) অতএব পদার্থ-বিজ্ঞান অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মাধীন, এবং অধীন হয়েই সার্থক, মনোবিজ্ঞান কিংবা সমাজতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে অধীন হতে পারেনা। অধীন হতে পারে সংখ্যা-শাস্ত্রের (Statistics), কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের (Mathematics) অধীনে এলে সার্থক হয় না। পূর্ব্বোক্ত দুই বিদ্যার মধ্যে পার্থক্যটুকু সকলেরই বিদিত।

ইতিহাসের মতন কোন মানুষ-সংক্রান্ত সামাজিকতত্ত্ব পদার্থ-বিজ্ঞানের মতন বহিঃপ্রকৃতি-সংক্রান্ত বিজ্ঞানের রূপ কখনও নিতে পারবে কিংবা নেওয়া উচিত এসব বিষয়ে বেশীদূর তর্ক চলতে পারে না। কারণ যে

উপায় অবলম্বন করলে তর্কের সিদ্ধান্ত হয় সেই উপায়টিই বর্ত্তমানে ন্যায়ের বিচারাধীন। তাছাড়া, বৈজ্ঞানিক সমাজের নানা গুণ থাকা সত্ত্বেও যখন নানা দোষ থেকেই যাবে, তখন পূরোপূরি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করলে সমাজতত্ত্ব হয়ত অচিরেই পদার্থ-বিজ্ঞানের কোঠায় উঠবে, তা তার সাহায্যে সমাজের ভবিষ্যৎ প্রগতি নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহজনক। বিজ্ঞানসম্মত সমাজ হয়ত এমন হবে যেখানে ব্যক্তি কিংবা অন্য অ-বৈজ্ঞানিক শক্তির দ্বারা নবতর সমাজের পুনর্গঠন একান্ত অবশ্যম্ভাবী ও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে। এপ্রকার ভবিষ্যদ্বাণী না করাই ভাল। আমার বক্তব্য গোড়াতেই বলে রাখচি—সমাজের আংশিকভাবে সত্য নিয়মগুলিকে (ঘটনার সাধারণ অভিমুখিনতা কিংবা ঝোঁকগুলিকে) পূর্ণতর সত্যে পরিণত করতে গেলে আপাতত যে উপায়ে বিজ্ঞানের ব্যাপকতর সত্যের সন্ধান মিলেছে সেই উপায় অবলম্বন করাই ভাল। উপায়টি হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, যেটি নির্ভুল না হলেও নিতান্তই উপকারী। এবং জ্ঞানের দিক থেকে দেখলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ইতিহাস হল প্রত্যয়ের ইতিহাস। তাই বলে ইতিহাস পদার্থ-বিজ্ঞান নয়, physico-chemical পদ্ধতিও একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয়, এবং পদার্থ কিংবা রসায়নবিদ্যার প্রত্যয় ও ইতিহাসের প্রত্যয় এক জিনিষ নয়।

পদার্থ-বিজ্ঞানকেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতিনিধি হিসেবে ধরছি। পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রকৃতি ও ইতিহাসের প্রকৃতির পার্থক্যটুকু স্বীকার না করে উপায় নেই। আমার মতে তিনটি মূলগত পার্থক্য আছে। (১) পদার্থ-বিজ্ঞান দেশ ও বিশেষত কাল-নির্দ্দেশ থেকে মুক্ত—অণুর গঠন ভারতবর্ষেও যা, হলাণ্ডেও তাই, আবার আজও যা বহু শতাব্দী পূর্ব্বেও তাই ছিল, এবং আজ হতে শতবর্ষ পরেও তাই থাকবে, পরিবর্ত্তনটি মতের মাত্র ; কিন্তু ইতিহাস দেশ ও কাল-নির্দ্দিষ্ট। অবশ্য দেশ ও কাল-নির্দ্দেশ নিয়তির নির্দ্দেশ নয়, নিয়মাধীন। (২) পদার্থবিজ্ঞানের বিষয়গুলি (data) কিংবা দত্তি সকল প্রত্যক্ষভাবে নিরীক্ষণ-লব্ধ, তার প্রতিপাদন পরীক্ষিত ও সর্ব্বদাই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত। প্রত্যক্ষের সঙ্গেই পদার্থ-বিজ্ঞানের কারবার। ইতিহাসে নির্দ্দিষ্টের সংখ্যা নিতান্তই কম। যে সব ঘটনা ঘটেছে তারই পুরাতন কিংবা সমসাময়িক বিবৃতি,

পুঁথি, শিলালিপি প্রভৃতি থেকে ইতিহাস উদ্ধার করতে হয়। শুধু এই চিহ্নগুলিকেই প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করা চলতে পারে, ঐতিহাসিকের বাকী কাজ অপ্রত্যক্ষভাবে পুনরুদ্ধার ; অনেকটা জুরী কিংবা ডিটেকটিভের মতন। ইতিহাসের প্রণালী হল প্রধানত অবরোহী। ঐতিহাসিকের জানা নেই কোন ঘটনা সত্য, কোনটি অসত্য, কোনটি অতিরঞ্জিত ; সত্য ঘটনা তাঁকে আবিষ্কার করতে হয়। (এখানে পুরাতন ঘটনার বৃত্তান্ত ও পারম্পর্য্যের বিবৃতি অর্থে ইতিহাস কথাটি ব্যবহৃত হচ্ছে।) All facts are born free and equal বলা চলে না, কারণ শৃঙ্খলা ও শিকলের গুরুত্ব এক নয়। বরঞ্চ, পূর্ব্বোক্ত উপায়ে যে সব দেশ ও কাল-নির্দ্দিষ্ট ঘটনা জানা যায় সেই সব ঘটনাকেই ঐতিহাসিক ঘটনা বলা চলে। সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে ঐতিহাসিকের জ্ঞান অ-প্রত্যক্ষ ও অবরোহী। (৩) পদার্থ-বিজ্ঞানে যতটুকু অবরোহ-প্রণালী বা বিলোম ব্যবহৃত হয় সেটি শুদ্ধ, অর্থাৎ তার মধ্যে নতুন কোন ঘটনা প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না, অবান্তর নামে তাকে বহিষ্কৃত করা হয়। ইতিহাসে তা চলে না, ইতিহাসে রবাহূতের সংখ্যা কম নয়, এবং তাদেরকে অন্তত মৌখিক অভ্যর্থনা করতেই হয়। সেইজন্য ইতিহাসের অবরোহ-প্রণালী অ-শুদ্ধ। অর্থাৎ ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশে যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ রয়েছে তার মধ্যে মানুষের প্রবৃত্তি, ইচ্ছাশক্তি, উদ্দেশ্য প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়াকে ধারণ করতে হবে। বহিঃ-প্রকৃতিতে যে সব আকস্মিক ঘটনা ঘটে তার প্রভাবকেও অবহেলা করলে চলবে না। ইতিহাসে আকস্মিকের স্থান আছে, যেমন জীবের অভিব্যক্তি-বাদে mutation,—সে স্থান কতটুকু কিংবা কতখানি বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। তবে আকস্মিককে স্বীকার করলে অবরোহ-প্রণালী বিশুদ্ধ থাকে না, এই তথ্য জানলে ইতিহাস ও পদার্থ-বিজ্ঞানের মধ্যে প্রকৃতি ও প্রণালী-গত পার্থক্য বোঝা যাবে।

পূর্ব্বোক্ত কারণে ইতিহাসের প্রত্যয় পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রত্যয় থেকে ভিন্ন হতে বাধ্য। পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রত্যয় অপেক্ষাকৃত মুক্ত, নিরালম্ব, বিষয়বস্তু থেকে নিষ্কর্ষিত হলেও অ-সংশ্লিষ্ট। সেগুলি একটি মনঃকল্পিত জগতের অশরীরী অধিবাসী। তারা যেন কোন বড় সাজ-পোষাকের

দোকানের ম্যানিকিন-প্যারেড, জনসাধারণ কাচের বাইরে রাস্তা থেকে তাদের দেখছে, বিস্মিত হচ্ছে, ঈর্ষান্বিত হচ্ছে। ব্র্যাড্‌লীর অতুলনীয় ভাষায়, তারা রঙ্গমঞ্চের রক্তহীন নর্ত্তকীর দল। কিন্তু ইতিহাসের প্রত্যয়গুলি রক্ত-মাংসের। তারা মূর্ত্ত, সংহত, দেশ ও কালনির্দ্দিষ্ট ব্যবহার থেকে অ-মুক্ত। প্রত্যয় মাত্রই মনঃকল্পিত, তবু যেন ঐতিহাসিক প্রত্যয়গুলি এই ব্যবহারিক জগতেরই অধিবাসী। জনসাধারণের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ যেন আরো ঘনিষ্ঠ, মধ্যে যেন বিশেষ ব্যবধান নেই। সামাজিক ব্যবহারের অভিব্যক্তি থাকার দরুণ ঐতিহাসিক প্রত্যয়ের বিষয়-সন্নিবেশ সুদীর্ঘকালের মধ্যে ব্যাপ্ত, পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রত্যয় সর্ব্বদাই কালাতীত। প্রাকৃতিক ঘটনাকে পরীক্ষাগারে এনে সহজ করা চলে, কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা পরীক্ষাগারে আনা যায় না, তারা জটিল ও বিচিত্র থেকেই যায়; সেইজন্য পদার্থবিজ্ঞানের প্রত্যয় বর্জ্জন করতে করতে তৈরী হয়, অর্থাৎ নৈতিবিচারের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়, কিন্তু ইতিহাসের বিষয়কে অ-প্রত্যক্ষভাবে জানা গেলেও ঐতিহাসিক প্রত্যয় অপেক্ষাকৃত সাক্ষাৎ-জ্ঞানলব্ধ, বর্জ্জন করলে তার অস্তিত্ব ভিন্নপ্রকৃতির হয়ে ওঠে, অর্থাৎ তার অস্তিত্বই থাকে না। অনেকটা সহযোগ ও অ-সহযোগনীতির মতন। ঐতিহাসিক প্রত্যয় আরো গতিশীল, ও কর্ম্ম-নিয়ামক। পদার্থবিজ্ঞানের প্রত্যয় সম্বন্ধে সচেতন হলে প্রকৃতির ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হয় না, কিংবা প্রকৃতিকে ভিন্ন পথে চালিত করা যায় না, শুধু বিজ্ঞানই অগ্রসর হয়, কিন্তু ঐতিহাসিক প্রত্যয়ের সাহায্যে, অর্থাৎ তার সম্বন্ধে সচেতন হলে সামাজিক প্রগতি ও পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অনুবৃত্তি গড্ডলিকা প্রবাহের মতন, পদার্থ-বিজ্ঞানের অনুবৃত্তি পর পর, চলচ্চিত্রে ফিল্মের ফোটোর মতনই। ইতিহাসের অতীত বর্ত্তমানে জাগ্রত হয় এবং ভবিষ্যতের আভাস দেয়, বরফের গোলার মত বড় হতে হতে চলে, পরের মধ্যে পূর্ব্ব অন্তত আংশিকভাবে অনুবিষ্ট হয়। এইজন্য ঐতিহাসিক প্রত্যয়ের মধ্যে মূল্যাবধারণ থাকেই থাকে, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের প্রত্যয়ের মধ্যে থাকলেই সর্ব্বনাশ। অবশ্য এইসব পার্থক্য আপেক্ষিক। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পার্থক্য কমে আসবেই আসবে, কিন্তু মূল্যজ্ঞান ও মূল্যবিচারকে একেবারে বর্জ্জন করতে ঐতিহাসিক

কখনও পারবেন কিনা জানিনা। কারণ পদার্থ-বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক মানুষ হলেও তাঁর বিষয় মানুষ নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক ডিটেকটিভ কিংবা জুরী হলেও মানুষ এবং তাঁর বিষয়ও মানুষ। এক্ষেত্রে মূল্য-বর্জ্জন ঐতিহাসিকের পক্ষে নিতান্তই কষ্টসাধ্য। মানুষ হয়ত অন্য মানুষকে যন্ত্র কিংবা সংখ্যায় পরিণত করতে চায়, কিন্তু নিজে হতে আপত্তি করে। অবশ্য যদি মূল্য-জ্ঞান খাঁটি সত্য ঘটনার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে ঐতিহাসিককে অন্য বৈজ্ঞানিকের মতন পূরোপূরি নির্ম্মমভাবে নৈব্যক্তিক না হলেও চলবে, তাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি লাঞ্ছিত হবে না। বিজ্ঞানের আদৎ কথা সত্যপ্রিয়তা, সেটা ঠিক্ মূল্যজ্ঞানের প্রতিকূল নয়।

শ্রেণী ও বিরোধ পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিক প্রত্যয়। বিরোধ সম্বন্ধে পরে লিখব। শ্রেণী বল্লেই দুটি মানসিক অবস্থা সূচিত হয়। (১) শ্রেণীর অন্তর্গত মানুষের মধ্যে একতা ও সাম্যভাব। সমভাব ও একতার জন্য সীমার মধ্যে সহানুভূতি জন্মায়; তাকে consciousness of kind-এর পরিবর্ত্তে feeling of kind বলা চলে; কারণ সচেতন অবস্থা সব সময় থাকে না, পরে আসে। (২) যারা অন্য শ্রেণীর জীব তাদের সম্বন্ধে নিজেদের উচ্চ কিংবা নিম্নশ্রেণীর জীব বলে স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট ধারণা। এই ভাবগুলি বহুভাবের সমষ্টি, কারণ উচ্চস্তর ও নিম্নস্তর একটি দুটি নয়, সমাজ বহুশ্রেণীতে বিভক্ত; অথচ প্রত্যেক শ্রেণী কোন না কোন স্থানে অন্য শ্রেণীকে স্পর্শ করেই আছে। ভাবগুলি নির্ভর করে শিক্ষা দীক্ষা, জীবন-যাত্রার উপায়, পরস্পরের আলাপ-পরিচয়, দূর কিংবা নিকট সম্বন্ধের ওপর, নানারকমের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অ-সমতার ওপর। এই হল মরিস্ গীনস্‌বার্গের মতে শ্রেণীর অর্থ। তাঁর মতে, শ্রেণীর সংজ্ঞার জন্য কোন উদ্দেশ্য কিংবা স্বার্থ প্রতিপন্ন করবার প্রয়োজন নেই, কারণ খুব কম শ্রেণীই সুস্পষ্টভাবে উদ্দেশ্য ও স্বার্থ সম্বন্ধে সজ্ঞান। বলা বাহুল্য, এই ব্যাখ্যা সমাজতত্ত্বের বেলা সঙ্গত হলেও আমরা যেভাবে ইতিহাসকে বুঝতে চেষ্টা করছি সেভাবে অর্থ বহন করে না। "আমরা একদলের" মনোভাবটি ইতিহাসের অন্য ঘটনাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; সেটি প্রধানত আর্থিক ব্যবহারের দ্বারা সৃষ্ট ও পুষ্ট; সজ্ঞান কিংবা অজ্ঞান অবস্থার ওপর তার

মৌলিক অস্তিত্ব নির্ভর না করলেও চেতনার ওপর তার পরিপুষ্টি ও সার্থকতা নির্ভর করে। যখন স্বার্থ ও উদ্দেশ্য উৎপাদনের অধিকারকে কেন্দ্র ক'রে কোন লোকসমষ্টি তৈরী করে তখনই শ্রেণীর উৎপত্তি। উৎপাদন অতি পুরাতন, শ্রেণীও অতি পুরাতন ; উৎপাদনের প্রক্রিয়া ও অধিকার বদলাচ্ছে, শ্রেণীর রূপ বদলাচ্ছে ; কিন্তু শ্রেণীও থাকছে, যেমন উৎপাদন ও অধিকার থাকছে। এক শ্রেণীর সীমা-নির্ণয় হয় অন্যান্য স্বার্থ-গণ্ডীর দ্বারা। তারা সর্ব্বদাই বাধা দিতে থাকে, কারণ উৎপাদন-শক্তি একই সমাজে এককালে এত প্রচুর নয় যে সকলের মধ্যে সমান ভাবে বিভক্ত হয়ে সব দলকে সন্তুষ্ট করতে পারে। কখনই করতে পারেনা, যতক্ষণ সমগ্র সমাজে সম্পত্তিগত সম্বন্ধ রাষ্ট্রের দ্বারা পরিষ্কারভাবে স্থিরীকৃত, এবং সম্পত্তি জনসাধারণের বদলে ব্যক্তির দ্বারাই অধিকৃত, অর্থাৎ যতক্ষণ অধিকার ভেদ থাকে। তা ছাড়া, সব শ্রেণীর মধ্যে যন্ত্র আবিষ্কার করার উপযুক্ত জ্ঞান এবং অন্যের আবিষ্কারকে অনুকরণ করে উৎপাদন শক্তিকে বৃদ্ধি করার সুযোগও সমান নয়। সেইজন্য শ্রেণীর মধ্যে বিরোধের বীজ থাকবেই থাকবে। বিরোধ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীও আরো দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হয়। বিরোধের তাৎপর্য্যই হল উৎপাদন শক্তির ওপর আধিপত্য বিস্তার, অর্থাৎ অন্য শ্রেণীর ওপর প্রভুত্ব-স্থাপন। ব্যক্তিগতভাবে প্রভুত্ব-স্থাপনের অর্থ নেতৃত্ব ; কিন্তু তার আদিতে জীবগত পার্থক্য থাকলেও তার অন্তত নিত্যতা ও চিরস্থায়িত্বের জন্য আর্থিক বৈষম্যই দায়ী। প্রভু নিজের পদত্যাগে সর্ব্বদাই অনিচ্ছুক, সেইজন্য প্রভুত্বরক্ষার অনিবার্য্য-পদ্ধতি অনৌদার্য্য ও 'জবরদস্তী'। তা ছাড়া সর্ব্বপ্রকার আধিপত্যের মধ্যে লাভের আশা রয়েইছে। মুনাফার আশাই শ্রেণীকে চালিত করে। শ্রেণী সেই জন্য কখনই লোকশ্রেয়কে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে না। তার মঙ্গল আংশিক। আদৎ কথা এই যে, সামাজিক অভিব্যক্তি ও সমসাময়িক ব্যবহারের মধ্যে বিরোধ ও সন্ধি, প্রভুত্ব ও দাসত্ব, লাভ ও ক্ষতি, সামাজিক কল্যাণ ও শ্রেণীর স্বার্থ এই চিরন্তন বিপরীত প্রবাহ ঐতিহাসিককে লক্ষ্য করতে হবে। শ্রেণী প্রত্যয়টি এই বিপরীত প্রবাহের বিজ্ঞানসম্মত প্রত্যয়। এই প্রত্যয়ের মধ্যে বিরোধ সূচিত হচ্ছে বটে, কিন্তু বিরোধ প্রত্যয়টি অনেকের মতে আরো ব্যাপক। বিরোধ

বিশ্বেরই নিয়ম, সে নিয়মের মানবিক প্রকাশ যখন ইতিহাসের মধ্য দিয়ে হয় তখন সেই বিরোধের আশ্রয়কে শ্রেণী, এবং সেই বিরোধকে শ্রেণী-বিরোধ বলা চলে। আমার মতে শ্রেণী ও বিরোধ সম্পূর্ণ পৃথক প্রত্যয় নয়।

একাধিক পণ্ডিতের মতে শ্রেণী-প্রত্যয়ের কোন সার্থকতা নেই, কারণ সেটিকে জাতিভেদের জাতি (caste), ব্যবসায়ের বৃত্তি (vocation, কিংবা profession) ও শিল্পজীবিকা (craft) থেকে পৃথক করা যায় না। এই মতকে গ্রাহ্য করতে আমি অনিচ্ছুক, কারণ শ্রেণীর পূর্ব্বোক্ত অর্থে তাকে অতি সহজেই পৃথক করা চলে। সমাজে একাধিক শ্রেণী আছে, তারা পরস্পর মিশে আছে—এবং ব্যক্তি একাধিক জনমণ্ডলীর আশ্রয়ভুক্ত, এ দুটি আপত্তি নয়, প্রত্যয় স্থাপনের বিপত্তি মাত্র। জাতিভেদের জাতি জন্মগত-সংস্কার, এতদিন তার মূল্য ধর্ম্মের দ্বারা নিরূপিত হয়ে এসেছে। শ্রেণীর সংজ্ঞায় ধর্মসংস্কারের স্থান নেই, থাকলেও প্রলেপের মতন। সুপ্রজনন-বিদ্যার সাহায্যে জাতির অস্তিত্ব প্রমাণিত কিংবা জাতিভেদ সমর্থিত না হলেও, সংখ্যার দিক থেকে বলা চলে যে সমাজের মধ্যে গুণগত বিভাগ আছে। অবশ্য ইতিহাসের ও বর্ত্তমান সমাজের শ্রেণী এবং গুণগত সাংখ্যিক বিভাগ এক নয়। যাদুবিদ্যা ছাড়া অন্য কোন বিদ্যার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে ব্রাহ্মণসম্প্রদায় বুদ্ধিতে ও চরিত্রে স্বভাবতই সব চেয়ে উঁচুস্তরের এবং শূদ্রেরা সবচেয়ে নীচুস্তরের। বিদেশী সমাজে যেখানে শ্রেণী পুরাতন হয়ে জাতির সংস্কার গ্রহণ করছে সেখানেও ঐকথা খাটে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের জাতি ধর্ম্মের প্রত্যয় মাত্র, জাতিগত অধিকারের মধ্যে আর্থিক স্বার্থের ও আধি-ভৌতিকের প্রভাব থাকলেও সে অধিকার আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কারের আবরণে প্রচ্ছন্ন। জাতির প্রকৃতি হল পারমার্থিকের সাহায্যে কিংবা আশ্রয়ে সমাজের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করা। অথচ বাইরে থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সেই স্থান ও মর্য্যাদা আপনা হতেই স্থির হয়ে আছে। বলা বাহুল্য, আপনা হতে কিছুই স্থির হয় না। যে শক্তি সামাজিক অবস্থান নির্দ্দেশ করে সে হল উৎপাদন-নামক সামাজিক প্রক্রিয়ার ইতিহাস ও অভিব্যক্তি, উৎপাদক-জনসমূহের সঙ্গে সমাজের অন্যান্য জন-সমূহের সম্বন্ধ, অর্থাৎ সম্পত্তির অধিকার ও অর্থ-রোজগারের ব্যবস্থা।

ধর্ম্ম-সংস্কার ও অভ্যাসের দ্বারা এই শক্তির প্রকাশ ও পরিণতি ব্যাহত হয়, ইতিহাসের প্রকৃতি ঢাকা পড়ে। শ্রেণীপ্রত্যয়ের দ্বারাই সে শক্তির পূর্ণ-পরিণতি সম্ভব হয়, অর্থাৎ ইতিহাসের প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়।

বৃত্তি অনেক প্রকারের। শিল্পবৃত্তি, (craft) ব্যবসা-বৃত্তি, (vocation) এবং profession, যেমন ডাক্তারী, ওকালতী, ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি। আমাদের পুরাতন ইতিহাসে শ্রেণী ও গণ আছে; প্রথমটি হল সম-ব্যবসায়ীর দল, দ্বিতীয়টি হল এমন দলের বৃত্তি যাতে একাধিক ব্যবসায়ীর সাহায্য নিতে হয়। এখন তাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পেতে বসেছে। ইন্দোর, মাদুরা প্রভৃতি স্থানে খুঁজলে তাদের সন্ধান মেলে, কিন্তু তাদের মূল শুকিয়ে গিয়েছে। আমরা যে অর্থে শ্রেণী বলছি তার সঙ্গে সে সব শ্রেণীর মূলগত কোন যোগ নেই। তারা এতদিন সংস্কারের পরগাছায় আচ্ছন্ন থেকেও বেঁচে ছিল, পরগাছা সরিয়ে নেবার পর দেখা গেল যে তারা মরে গিয়েছে। সংস্কার-পুষ্ট জাতির আদিতে একপ্রকার উৎপাদন-শক্তি কাজ করত; শ্রমবিভাগ, যোগ্যতা, ও শিক্ষা-নবীশীর সুবিধা অনুসারে সে শক্তি বিভক্ত হয়ে বৃত্তির স্থষ্টি করেছিল; একজাতি অন্য একাধিক জাতিতে বিভক্ত ও একাধিক জাতি একটি জাতিতে পরিণত হওয়ার মধ্যেও সে শক্তি কাজ করে এসেছে। আজকাল যে শক্তির দ্বারা জাতিবিভাগ কিংবা জাতিগঠন হচ্ছে তার পরিচয় অর্থনীতিতে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় ধর্ম্মসংস্কারের ইতিহাসে, কিংবা রাজনৈতিক লাভের লোভে। কিন্তু আদৎ ব্যাপারটি অন্যরূপ, যদিও রূপ এখনও প্রকট হয়নি। আজ ব্রিটিশ অধিরাজ্যের আশীর্ব্বাদে ভারতবর্ষের অন্ততঃ পণ্যদ্রব্য-উৎপাদনের রীতিনীতি বদলেছে। সমাজ সেই নতুন শক্তি ধারণ করতে পারছে না, পুরানো বোতল যেমন নতুন মদ ধারণ করতে পারে না। তাই সমাজে বিপ্লব এসেছে, সেই আধার ও আধেয়র মধ্যে বিরোধের ফলে সত্যকারের শ্রেণী তৈরী হবার সুযোগ তৈরী হচ্ছে। এখনও নতুন শ্রেণী তৈরী হয়ত হয়নি, কেননা এই বিরোধটি প্রকৃতপক্ষে বিরোধ নয়, গৃহ-বিবাদ মাত্র, তাই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া দেখছি। নতুন শ্রেণী যদি হয়েও থাকে তবুও সে শ্রেণী ইতিহাসের পটে নিজের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন নয়। নট এসে হাজির হয়নি, দর্শকবৃন্দের মধ্যে

একজনকে ধরে ক'রে নামান গেল, তিনিও নটযশপ্রার্থী অথচ শঙ্কিতচিত্ত, আশ্বাস দেওয়া গেল উৎকৃষ্ট স্মারক আছেন; কিন্তু প্রম্পটিংএর জোরে কতদূর চলে? বিশেষতঃ যখন প্রতিপক্ষের নিজের কথাই মনে নেই। এ অবস্থার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত, তাই একটু ভুলচুক হতেই হবে। এখন আমার বক্তব্য এই যে, কি হিন্দু কি য়ুরোপীয় সমাজে (চীনদেশেও) জাতি, কারুশ্রেণী ও সমবৃত্তিধারী জনসঙ্ঘের ব্যবস্থান নিরূপিত হত উৎপাদনের রীতি নীতির দ্বারা। কৃষিপ্রধান সমাজে কারুশিল্প প্রস্তুত হত সৌখীন সম্প্রদায়ের ভোগতৃপ্তির জন্য, কর্ষণ-বৃত্তির অতিরিক্ত কাজ হিসেবে। চাহিদা না এলে উৎপাদনই হত না। তখন এক জমীদার-সম্প্রদায়ই নিজেদের অস্তিত্ব, কর্ম্ম ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাই তাঁরাই হলেন তখনকার একমাত্র শ্রেণী, আমাদের অর্থে। এখন কিন্তু উৎপাদনের প্রক্রিয়া উল্‌টে গিয়েছে, (যদিও সম্পত্তির প্রকৃতি ও রূপ একই রয়েছে)। শিল্পীর সংখ্যা আর মুষ্টিমেয় নেই, সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের দলের পুরাতন গুণ লুপ্ত হয়েছে। তারা ছিল শিল্পী ও বিশেষজ্ঞ, যত লোক বাড়ল, ততই শিল্প-জ্ঞানের বদলে শুধু শ্রম করবার দৈহিক শক্তি ও বিশেষ জ্ঞানের বদলে সাধারণ-বুদ্ধি ও তৎপরতার আবশ্যক হল। এখন প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রমিকের বৃত্তি স্বপ্রধান হয়ে উঠেছে, অন্যবৃত্তির ওপর নির্ভর করছে না, কেননা কৃষি-কার্য্যে মুনাফা কম, কুটীরশিল্পও নষ্ট হয়েছে। চাহিদা আছে কি নেই শ্রমিক-শ্রেণীকে বুঝতে হয় না, তাদের কর্ত্তব্য শুধু খাটা, সবই বোঝেন তাঁদের প্রভুরা, তাও হিসাবে গোলমাল হয়, ফলে অতিরিক্ত উৎপাদনই হচ্ছে। বাস্তবিকপক্ষে প্রত্যক্ষ চাহিদা এখন কলের, কল চালিয়ে রাখতেই হবে, কল বন্ধ হলেই সর্ব্বনাশ হবে। কলই এখন শ্রমিকের প্রভু। তাছাড়া পূর্ব্বোক্ত বৃত্তির শ্রম ছিল হাতের, শিল্প ছিল প্রথা-সঙ্গত; প্রথার পরিবর্ত্তন কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা হতে পারত না, সামান্য যে একটু আধটু পরিবর্ত্তন হত তা হাতে কাজ করতে করতে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয় তারই দ্বারা, ধীরে, অতিধীরে, সংস্কারকে খাতির করে। এখন বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদে প্রত্যহই নতুন কল তৈরী হচ্ছে, শ্রমিকও শিল্পীর অভিজ্ঞতার মূল্য কমে আসছে, সে অভিজ্ঞতা বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার কোন সুযোগ নেই—শ্রমবিভাগ

আরো বিভক্ত ও বিশেষ হচ্ছে। শ্রমিকদল বিজ্ঞান জানেনা, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা তারা করতে পারেনা, তাদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ নেই। প্রভু-শ্রেণীর ধারণা এই যে শ্রমিকেরা শুধু শ্রম করতেই জানে, বিজ্ঞানশিক্ষার উপযুক্ত নয় তারা। প্রমাণও মিলছে বড় বড় অধ্যাপকের বইতে; সুপ্রজনন বিদ্যাই নাকি তাই বলছে! উচ্চশিক্ষায় খরচও অত্যধিক, সব উচ্চবিদ্যালয়ও প্রোফেশনালদের হাতে, সে বিদ্যালয়ের টাকাকড়িও দিয়েছেন বড়লোকেরা, জমীদার ও কলের মালিকরা। অতএব তাঁদের সন্তানরাই বৈজ্ঞানিক হবেন, বড় বড় প্রোফেশনে যোগ দেবেন।

এ বিবরণ আজকালকার অবস্থার। ইতিমধ্যে অতি গোপনে একটি নতুন শ্রেণী গোকুলে বেড়ে উঠেছে। তার নাম প্রোফেশন। কারুশিল্প দৈহিক শ্রমে পরিণত হবার পূর্ব্বে একটি বিশেষজ্ঞের দল তৈরী হয়। তাঁরা মস্তিষ্কের দ্বারা হাতের কাজকে অর্থাৎ কারুশিল্পকে সহজ করে দিলেন, অর্থাৎ শ্রমবিভাগকে আরো বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। মোটা রবারকে টেনে পাতলা করা যায়, আরো টানলে ছিঁড়ে যায়। তাই আজ প্রোফেশনের উত্তমাঙ্গটি অর্থাৎ পণ্ডিতবর্গ সমাজ-দেহ থেকে বিচ্যুত হতে বসেছেন; সমাজ এখন ছিন্নমস্তা। পণ্ডিতেরা সামাজিক-ব্যবহার রূপ উদ্দেশ্যকে বর্জ্জন করেছেন ও প্রতিশোধে সমাজও তাদেরকে বর্জ্জন করছেন। বর্ত্তমান যুগান্তরের সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার হল এই—পণ্ডিতে যা বলছেন, দেশনেতারা তার বিপরীত কাজ করছেন। পণ্ডিতে চাইছেন স্বাধীন-বাণিজ্য কিংবা বাণিজ্যে শান্তি, ঘট্‌ছে ঠিক তার উল্‌টোটি, ট্যারিফের দেয়াল উঁচু হয়েই চলেছে, বিরোধ বেড়েই চলেছে। অত্যধিক শ্রমবিভাগের ফলে, বুদ্ধি ও কর্ম্মের, বিজ্ঞান ও প্রয়োগশিল্পের, মতামত ও ব্যবহারের, বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীর মধ্যে সামাজিক বন্ধনটি ছিঁড়ে গিয়েছে। তারই দরুণ ধনীরা যারা শুধু শ্রমিক তাদেরকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছেন। প্রোফেশন-গুলির ঐতিহাসিক ভূমিকা হল এই—তাদের উৎসাহে যেমন বিজ্ঞান ও বিশেষ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে, তেমনি তাদেরই কর্ম্মফলে শ্রমিকের অধোগতি সাধিত হয়েছে। ভাল ও মন্দ একই কার্য্যের কর্ম্মফল—ঐতিহাসিক নিয়তির রীতিই তাই। জ্ঞানের দ্বারাই এ নিয়তির কবল থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

এক্ষেত্রে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে প্রোফেশনগুলি এক একটি শ্রেণী। তা নয়, কারণ উৎপাদন-শক্তিকে বাড়িয়েও তারা উৎপাদন-শক্তির ওপর অধিকার বিস্তার করেনি, তারা সমাজ-ধনের অল্পাংশ নিয়েই সন্তুষ্ট রয়েছে। তাও দক্ষিণা হিসেবে। কারণ, তারা নিষ্কাম হলে কি হয়, অন্য একটি শ্রেণী বেশই সকাম। বিশেষজ্ঞের দল আজ এই শ্রেণীর আজ্ঞাবহ দাসানুদাস, নিতান্তই অনুগত ভৃত্য। তা ছাড়া তাঁরা নিজেদের কর্ম্মের ঐতিহাসিক কর্ম্মফল সম্বন্ধে সচেতন নন্। তাঁদের ধর্ম্ম "মা ফলেষু কদাচন।" জ্ঞানযোগীর দলকে শ্রেণী বলতে কুণ্ঠা হয়। শ্রেণীর ধর্ম্ম কর্ম্মযোগের।

য়ুরোপের প্রোফেশনের ইতিহাস উদ্ধার করা হয়েছে। গোড়ায় জনকয়েক ব্যবসায়ী অবসরকালে নিজেদের মধ্যে সামাজিকভাবে মেলামেশা ও স্ফূর্ত্তির ফাঁকে নিজেদের ব্যবসা-সংক্রান্ত আলোচনা করতেন। পরে তাঁরা ভদ্র অবস্থার উপযোগী আয় দাবী করলেন। অকারণে তাঁরা দাবী পেশ করেননি। তাঁরা বহুদিন ধরে শিক্ষানবীশী করেছেন, ফলে তাঁদের অনেক অভিজ্ঞতাও হয়েছে, এবং সেই অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে তাঁরা বিশেষ জ্ঞানও অর্জ্জন করেছেন, যার ফলে সমাজের উপকার হয়েছে, ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়েছে। একটি বিশেষ জ্ঞান-পদ্ধতি তাঁদের করায়ত্ত, এবং সেই টেকনিকের প্রয়োগে তাঁরাই একমাত্র দক্ষ, অন্যে নয়। এই হল কার-সণ্ডার্সের মতে প্রোফেশনের ইতিহাস। হোইটহেডের নতুন বই থেকে কয়টি লাইন উদ্ধৃত করে দিচ্ছি;—

Profession means an avocation whose activities are subjected to theoretical analysis and are modified by theoretical conclusions derived from that analysis.

অর্থাৎ পূর্ব্বদৃষ্টি হবে থিওরীর ওপর প্রতিষ্ঠিত, এবং থিওরী প্রতিষ্ঠিত হবে বৃত্তিলব্ধ অভিজ্ঞতার ওপর। সিডনী ওয়েবের মতে প্রত্যেক প্রোফেশনের পিছনে সৃজনী-শক্তি, অধিকার ও সম্পত্তিজ্ঞান, এবং সহানুভূতির প্রেরণা আছে। এই মতটির মূল্য হয়ত খুব বেশী নয়, কারণ প্রায় সব দলের মূলেই আছে এই তিন প্রকারের প্রবৃত্তি। তাদের সাহায্যে শ্রেণীকে বৃত্তি থেকে পৃথক করা যায় না। অন্য দুটি সংজ্ঞার দোষ ও অসম্পূর্ণতা

পূর্ব্বেই দেখিয়েছি, তবু সংজ্ঞা দুটি উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য শুধু এই দেখান যে প্রোফেশনের বিশেষত্ব অন্যমতাবলম্বী ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকের কাছেও ধরা পড়েছে। ভারতবর্ষের প্রোফেশনগুলি নিতান্ত খোলাখুলি ভাবেই বিদেশী ধনী-সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার ও রক্ষার জন্যই সৃষ্ট ও লালিত পালিত।

অতএব শ্রেণী বলতে আমরা এই কয়টি প্রস্তাব গ্রাহ্য করি। (১) উৎপাদন শক্তিকে কেন্দ্র করে জনসঙ্ঘ গড়ে ওঠে; (২) ইতিহাস-নির্দ্দিষ্ট উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে এক একটি জনসঙ্ঘের সম্পর্ক স্থাপিত হয়; উৎপাদনটি সামাজিক ব্যাপার এবং সম্পর্কটি রাষ্ট্রের দ্বারা সাধারণত স্থিরীকৃত, ও আইনের দ্বারা অনুমোদিত; (৩) সম্পর্কস্থাপনের পর সামাজিক শ্রম ও সম্পত্তি এই জনসঙ্ঘের মধ্যে বিভক্ত হয়, পরে সেই বিভাগ রাষ্ট্রের দ্বারা চিরন্তন ব'লে ঘোষিত হয়। এই প্রকার জনসঙ্ঘকে শ্রেণী বলা হচ্ছে। অতএব ঐতিহাসিক প্রগতিতে শ্রেণীর একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। শ্রেণী-বিরোধের জন্যই সমাজ বর্ত্তমান আকার ধারণ করেছে। পুরাতন পুঁথি ঘাটা ছাড়া যদি বর্ত্তমানের সঙ্গে ইতিহাসের কোন যোগ থাকে, ইতিহাস যদি সমসাময়িক বিবৃতি হয়, এবং ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত দেয় এবং নিয়ামক হয়, অর্থাৎ ইতিহাস যদি কেবল পৌনঃপুনিক ইতিবৃত্ত না হয়ে গতিশীল ও কর্ম্মনিয়ামক হয়, তাহলে শ্রেণী-প্রত্যয়টি এই অর্থেই গ্রহণ করতে হবে, ও শ্রেণী-বিরোধকে ঐতিহাসিক প্রগতির একটি মূল শক্তি স্বীকার করতেই হবে। (৪) জনসঙ্ঘ ঘনীভূত হবার প্রকৃষ্ট উপায় হল বিরোধ; (৫) বিরোধের প্রকৃতিই হল লাভের আশা ও উৎপাদন-কেন্দ্রের ওপর একাধিপত্য বিস্তার। অন্য ভাষায় বলতে গেলে,

"Classes are groups of people, such that one group may appropriate to itself the toil of the other owing to the difference of their (historic) situation, which is itself determined by the mode of their economic life."—Moscow Dialogues. (Hecker)

(৬) নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন না হলে শ্রেণী হয়না, এবং শ্রেণী-বিরোধ সম্বন্ধে সজ্ঞান না হলে সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয়না। বলা বাহুল্য সব প্রতিজ্ঞাই একটি মূলসূত্রের চারপাশে দানা বেঁধে রয়েছে।

(৭) অনেকের মতে অর্থ-নৈতিক ও ঐতিহাসিক উৎপত্তি ছাড়া শ্রেণীর অন্য উৎপত্তি আছে, যেমন ধর্ম্মসংস্কার, সামাজিক সংস্কার, রাষ্ট্রের রীতিনীতি। রাজনৈতিক কারণগুলি বিরোধের মধ্যে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, তাই আমাদের সংজ্ঞায় তারা ইতিপূর্ব্বেই গৃহীত হয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষা, সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগের সামাজিক কারণগুলি মূলত অর্থ-নৈতিক। ধর্ম্ম-সংস্কারের পার্থক্যে যে সামাজিক বিভাগ হয় সেটি শ্রেণীবিভাগ নয়। অনেক সময় সংস্কারগত পার্থক্য শ্রেণীবিভাগকে বাধা দেয়, কিংবা প্রচ্ছন্ন রাখে। তাই ব'লে এই কারণগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তারা আছে এবং সুখে স্বচ্ছন্দেই আছে। তাদের ইমারৎ সুদৃঢ়, তবে তাদেরও ভিত্তি অর্থ নৈতিক মনে রাখা চাই।

গত অধ্যায়ে শ্রেণীর পুরানো ইতিহাস বর্ণনা করেছি। এই অধ্যায়ে ইতিবৃত্ত ও সমসাময়িক ইতিহাসের ধর্ম্ম বোঝবার জন্য একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় প্রত্যয় ব্যাখ্যা করলাম। ভবিষ্যতে শ্রেণী কি আকার নেবে একমাত্র তিনিই বলতে পারেন যাঁর নখদর্পণে বৈজ্ঞানিক উৎপাদনের ভবিষ্যৎ প্রতিফলিত হয়। কিন্তু তর্কবুদ্ধির দিক থেকে বলা চলে যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি-জ্ঞান, উৎপাদনের ওপর একাধিপত্য এবং স্বার্থবুদ্ধি কমলে বিরোধের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হবে, ও সেই সঙ্গে শ্রেণীও ব্যাপক হবে, সমাজের মধ্যে প্রসারিত হবে। তখন শ্রেণীবিরোধের ভীষণতা থাকবে না। বিরোধ একপ্রকারে না হোক অন্য প্রকারে থাকবে, কেননা বাধা-বিপত্তি, বিবাদ ও বিরোধের মধ্য দিয়ে অগ্রস্থতিই হল বোধ হয় বিশ্ব-চরাচরের নিয়ম। বিরোধের অবসানে বিশ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সচেতনভাবে এই বিশ্বশক্তিকে শ্রেণীবিভাগ তুলে দেবার কাজে নিয়োজিত করাই ঐতিহাসিকের একমাত্র সামাজিক কর্ত্তব্য। সমাজের দিক থেকেও বটে, ব্যক্তির দিক থেকেও তাই, কারণ শ্রেণীতে বিভক্ত হবার জন্যই মানুষ মানুষ হতে পারছে না। অথচ এ না হয়ে উপায় ছিল না। সমাজের প্রকৃতিতে যে সব অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য, বৈপরীত্য, বৈসাদৃশ্য, বিরোধ-বিসম্বাদ রয়েছে তাদেরকে প্রকাশ, খণ্ডন ও সমন্বয় করতে করতেই সমাজের অভিব্যক্তি হয়েছে ও হবে। যখন সচেতনভাবে কোন একটি মণ্ডলীর দ্বারা এই

কার্য্য সাধিত হয় তখন সেই কার্য্যের নাম হল শ্রেণী-বিরোধ। এই হল শ্রেণীবিরোধের প্রকৃত তাৎপর্য্য। আমি জানি, এই অধ্যায়ে ন্যায়শাস্ত্রের সংজ্ঞা স্থাপন করা হলনা। আমরা যেভাবে ইতিহাস বুঝতে চেষ্টা করি তার সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের সংজ্ঞা খাপ খায়না। আমাদের প্রত্যয় পথ দেখিয়ে দেয়, অগ্রসর হতে সাহায্য করে, গন্তব্য নির্দ্দেশ করে।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

যৌনাতীত

(Supra-sex)

অধ্যাপক উস্‌পেন্‌স্কির (Ouspensky) নাম সুধীসমাজে প্রায় ...র সমাদৃত। এই আচার্য্যকল্প রুষ মনস্বী একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ...কবি। উস্‌পেন্‌স্কি কোন দিন কোন কবিতা রচনা করিয়াছেন, জানা ...—কিন্তু তথাপি তিনি কবি। কবি না হইলে, মর্ম্মরের সজাগ স্বপ্ন ...গ্রার তাজমহল এবং সিংহলের মারকত-চক্ষু বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি ...নও ভূমানন্দে বিভোর হইতেন না। প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার Tertium Organum নামক যুগান্তরকারী গ্রন্থ রাশিয়ান্ ভাষায় প্রকাশিত ...। ঐ গ্রন্থের আমেরিক্যান অনুবাদক মুখবন্ধে লিখিয়াছিলেন—From ...e point of view, it it a terrible book; there is ...evolution in it—a revolution of the very poles of thought। ঐ গ্রন্থে উস্‌পেন্‌স্কি বৈদান্তিক চিন্তার প্রতিধ্বনি করিয়া ...লিয়াছিলেন—As a matter of principle, it is not important which we regard as First Cause—spirit or matter. It is essential to recognise their unity. First cause—...সর্বকারণ-কারণ', বিশ্বের অমূল মূল একমেবাদ্বিতীয়ম্—যতঃ প্রধান-পুরুষৌ।

সম্প্রতি অধ্যাপক উস্‌পেন্‌স্কির বিরাট্ গ্রন্থ A New Model of the Universeএর ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশক Kegan Paul, Trench, Trubner and Co Ltd, London, 1931. প্রকাশক গ্রন্থের উপনাম দিয়াছেন—Principles of the Psychological method in its application to problems of Science, Religion and Art. ৫৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী বৃহৎ গ্রন্থ—...ভীর, গম্ভীর, মৌলিক চিন্তায় পরিপূর্ণ—অনেক শিখিবার ও ভাবিবার ...থা আছে।

কার্য্য সাধিত হয় তখন সেই কার্য্যের নাম হল শ্রেণী-বিরোধ। এই হল শ্রেণীবিরোধের প্রকৃত তাৎপর্য্য। আমি জানি, এই অধ্যায়ে ন্যায়শাস্ত্রের সংজ্ঞা স্থাপন করা হলনা। আমরা যেভাবে ইতিহাস বুঝতে চেষ্টা করছি তার সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের সংজ্ঞা খাপ খায়না। আমাদের প্রত্যয় পথ দেখিয়ে দেয়, অগ্রসর হতে সাহায্য করে, গন্তব্য নির্দ্দেশ করে।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

যৌনাতীত

(Supra-sex)

অধ্যাপক উস্‌পেন্‌স্কির (Ouspensky) নাম সুধীসমাজে প্রায় সর্ব্বত্র সমাদৃত। এই আচার্য্যকল্প রুষ মনস্বী একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও কবি। উস্‌পেন্‌স্কি কোন দিন কোন কবিতা রচনা করিয়াছেন, জানা নাই—কিন্তু তথাপি তিনি কবি। কবি না হইলে, মর্ম্মরের সজাগ স্বপ্ন আগ্রার তাজমহল এবং সিংহলের মারকত-চক্ষু বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি কখনও ভূমানন্দে বিভোর হইতেন না। প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার Tertium Organum নামক যুগান্তরকারী গ্রন্থ রাশিয়ান্ ভাষায় প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থের আমেরিক্যান অনুবাদক মুখবন্ধে লিখিয়াছিলেন—From one point of view, it it a terrible book; there is revolution in it—a revolution of the very poles of thought। ঐ গ্রন্থে উস্‌পেন্‌স্কি বৈদান্তিক চিন্তার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছিলেন—As a matter of principle, it is not important which we regard as First Cause—spirit or matter. It is essential to recognise their unity. First cause—'সর্ব্বকারণ-কারণ', বিশ্বের অমূল মূল একমেবাদ্বিতীয়ম্—যতঃ প্রধান-পুরুষৌ।

সম্প্রতি অধ্যাপক উস্‌পেন্‌স্কির বিরাট্ গ্রন্থ A New Model of the Universeএর ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশক Kegan Paul, Trench, Trubner and Co Ltd, London, 1931. প্রকাশক গ্রন্থের উপনাম দিয়াছেন—Principles of the Psychological method in its application to problems of Science, Religion and Art. ৫৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী বৃহৎ গ্রন্থ—গভীর, গম্ভীর, মৌলিক চিন্তায় পরিপূর্ণ—অনেক শিখিবার ও ভাবিবার কথা আছে।

গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের নাম—Sex and Evolution। ঐ অধ্যায় পাঠ করিয়া, এ দেশে আমরা যাহাকে 'উর্দ্ধরেতাঃ' বলি, সে সম্বন্ধে এক নূতন আলোক-রশ্মির সাক্ষাৎ পাইয়াছি—'পরিচয়ে'র পাঠককে তাহার ভাগী করিতে চাই। প্রাচীন সত্য-সকল নবীন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তা দ্বারা কিরূপে উদ্ভাসিত হইতেছে, ইহা তাহার অন্যতম নিদর্শন।

এ দেশের ঋষিরা মানবকে 'শিশ্নোদর-পরায়ণ' বলিয়াছেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে এ বিশেষণ সার্থক বটে। বুভুক্ষা ও রিরংসা—ক্ষুধা ও কাম—Hunger and Sex—মানবের এই দুইটি প্রবলতম বৃত্তি। এই দুইয়ের মধ্যে কাম ক্ষুধার অপেক্ষাও দুর্দম। সেই জন্যই আমাদের আদিপিতা মনু মানবকে সতর্ক করিয়াছেন :—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাসম্ অপি কর্ষতি॥

উস্‌পেন্‌স্কি এই কামকে 'love' বলিয়াছেন—'love' শব্দকে প্রেমের প্রতিশব্দ-রূপে স্বতন্ত্র রাখিয়া, কামকে 'lust' বলিলেই ভাল হয়। কারণ,

কাম আর প্রেমে হয় বহুত অন্তর,
এক অন্ধ তমঃ, অন্য উজ্জ্বল ভাস্কর।

This attraction of the sexes to one another, 'love', constitutes one of the chief motive forces in life, and its intensity and the forms of its manifestation determine almost all other characteristics and qualities in man.—A new Model of the Universe, p. 516.

এই যে কাম—স্ত্রী পুরুষের মিথঃ-আকর্ষণ—রিরংসা—এই কাম-সৃষ্টিতে নিসর্গের উদ্দেশ্য কি? মূল উদ্দেশ্য বংশরক্ষা।

In creating 'love', nature has only one aim—the continuation of life.—p 516.

কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যতটা পর্য্যাপ্ত, নিসর্গ তদপেক্ষা অনেক বেশি কাম জীব-হৃদয়ে সঞ্চিত করিয়াছেন।

Nature has created in man much more 'love' than is actually necessary for the purpose of continuation of life.

সেই জন্যই কি William Blake lustকে 'bounty of God' বলিয়াছেন? অথচ—How small a proportion of sex-energy is actually used for the continuance of life! (Ouspensky) *

এই যে অতিরিক্ত কাম-শক্তি—ইহার ব্যবহার কি? All this surplus of 'love' must be used up somehow.

ঐ অতিরিক্ত কাম-শক্তির প্রথম ব্যবহার 'in keeping up of the breed', the preservation of the species at a *definite level*', by maintaining what are called 'secondary sexual characters' viz those definite anatomical and physiological traits, characteristic of man as well as of woman respectively.

স্ত্রী পুরুষের লিঙ্গভেদই তাহাদের মুখ্য প্রভেদ বটে। সেই জন্য জীব-বিজ্ঞান উহাকে প্রাথমিক বা primary character বলেন। তা' ছাড়াও নর ও নারীর মধ্যে পুংস্ত্ব ও স্ত্রীত্বসূচক কতকগুলি চিহ্ন আছে (যেমন পুরুষের গোঁপদাড়ি, স্ত্রী-লোকের স্তনজঘন)। ইহারা অমুখ্য হইলেও স্ত্রী পুরুষের ভেদ-ব্যাবর্ত্তক। ইহাদিগকে জীব-বৈজ্ঞানিক secondary sexual characters বলেন। ঐ অমুখ্য characters সম্পর্কে উস্‌পেন্‌স্কির বক্তব্য এই :—

They are all those features (apart from the sex organs themselves) which make man and woman different from and unlike each other: e. g. difference in the lines of the body, different distribution of muscles and fat in the body, different distribution of hair on the body, a different voice, and all

* তবে এ লঘুক্রিয়ার জন্য এত বহ্বারম্ভ কেন? ইহার উত্তরে উস্‌পেন্‌স্কি বলেন :—

That is evidently Nature's way. Nature creates an immense pressure, an immense (intense) tension, in order to attain a certain aim, but uses, in actual fact, for the attainment of this aim, an infinitesimal fraction of the energy created. Why? Because, without this immense inflow of force, probably the original aim would not be attained. So she blinds man by this surplus of energy, makes him a slave and so forces him to serve the purpose of nature.

that makes up masculine and feminine psychology (that is difference in instincts, sensations, tastes, temperament, emotions &c.).

এই সকল অমুখ্য বা secondary character-সমূহের সৌষ্ঠব ও স্থিরতা—মুখ্য পুং ও স্ত্রী লক্ষণের অর্থাৎ Primary sexual character-এর উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে। ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য উস্পেন্স্কি বলিতেছেন—

Abundance and richness of secondary characters points to an improving, an ascending type. On the other hand, the decline of the type is always indicated by the weakening and alteration of secondary characters.

শুধু তাই নহে—ইহাও প্রমাণসিদ্ধ যে, কি পুরুষে কি রমণীতে, জননেন্দ্রিয়ের বিক্ষতি, অবনতি বা পরিবর্ত্তনের ফলে ঐ সকল প্রাগুক্ত অমুখ্য বা secondary characterগুলিও আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং পুরুষে স্ত্রীর এবং স্ত্রীতে পুরুষের লক্ষণ সকল প্রাদুর্ভূত হয় ('appearance of masculine characters in a woman and of feminine characters in a man') *। এ সম্পর্কে উস্পেনস্কির উক্তি আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

It has been established beyond doubt that both for man and woman, a weakening or an anatomical change of the essential parts of the sex organs or their injury, leads to a complete alteration of the external type and to a change in the secondary characters, different for man and woman, but following a certain definite system, that is to say, in a man, an injury to his sex organs and the derangement of their functions cause him to resemble either a child or an old woman and in a woman the same thing causes her to resemble a man.

কচিৎ কদাচ যে যৌন পরিবর্ত্তন বা লিঙ্গব্যত্যয়ের কথা (transformation of sex) শুনা যায়, উহারও মূলতঃ ব্যাপার ওই। মহাভারতে স্ত্রী

* In the case of weakening of direct functions or injury to the sex-organs, the secondary characters are immediately modified, become weaker or even disappear.

শিখণ্ডীর নপুংসকত্ব-প্রাপ্তি পৌরাণিক কল্পনা বলিয়া উপেক্ষা করিলেও, এদেশের ও বিদেশের হাঁসপাতালের নথিতে ঐরূপ পরিবর্ত্তনের কাহিনী বিরল হইলেও একেবারে অজ্ঞাত নহে। এ প্রসঙ্গে এডিনবারা বিশ্ববিত্তালয়ের ডাক্তার ক্রুর সাক্ষ্য স্মরণ করা ভাল। ডাক্তার ক্রু (who is the head of the Animal-breeding Department of the University) বলেন—'A hen which had laid many broods of eggs from which chickens had been reared, began in old age to assume the plumage and manners of a cock. The bird actually succeeded in 'treading'—that is fertilising—other hens which then laid eggs. * * * When it was killed, it was found that the ovary or egg-producing organ had been destroyed by disease, but that a testis or spermatozoon-producing organ had been budded off the cells lining the body cavity.

এ সম্পর্কে ডাঃ ক্রুর সিদ্ধান্ত এইরূপ :—

An individual of one "determined" sex can be so transformed at a later period that it will fulfil its life as a member of the opposite sex. In insects there are many such instances, and it is not infrequent that a particular insect which began life as a female and thus passed through the earlier stages of development, later on switched over and became a more or less complete functional male. * * * Frogs, fowls, pigeons and goats also provide frequent examples of sex transformation. In frogs there had been cases of an adult female becoming a male and subsequently the father of a family consisting solely of daughters ইত্যাদি।

সে যাহা হ'ক, আমরা আসল কথায় ফিরিয়া যাই। আসল কথা এইযে, where you have a man with the features and character of a woman or viceversa, it indicates firstly degeneration and secondly wrong development that is usually under-development of the primary characters; কারণ, where as a high development of these traits points to a sound type, a weak or a wrong expression definitely points to a degenerating type (Ouspensky).

এই সকল প্রমাণে উস্পেনস্কি বলেন যে, it is clear that the surplus

of sex energy is used precisely for the improvement of the breed.

কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই প্রকৃতিদত্ত কামশক্তি (sex energy) মানবের মধ্যে এতই প্রভূত ও প্রচুর যে, বংশরক্ষা কার্য্যে ও সন্ততির সৌকর্য্যেই (improvement of the breed), উহা নিঃশেষিত হয় না। উহার যে surplus বা অতিরেক থাকে, আমরা প্রায়শঃ তাহার অপ-ব্যবহার করি। উস্পেন্স্কি বলেন—

Under ordinary conditions it is used up by being transformed into other emotions and other kinds of energy, which often are contradictory, harmful from the point of view of evolution, pathological, incompatible with one another, and destructive.

এই কামশক্তি ব্যাহত বা প্রতিহত হইয়া বিপথগামী হইলে, কিরূপ ধ্বংসকারী হয় ও কেমন সংহার মূর্ত্তি ধারণ করে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সীতারাম-উপন্যাসে অমর তুলিকায় তাহা চিত্রিত করিয়াছেন। বুঝিয়া দেখিলে, উস্পেন্স্কির উক্তি ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রণ গীতার সেই প্রাচীন বাক্যেরই সম্প্রসারণ।

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

বস্তুতঃ এ পথে পদক্ষেপ করিলে নিসর্গের অভিসন্ধি ব্যর্থ করা হয়, প্রকৃতিদত্ত কামশক্তির অতিরেকের (surplusএর) অসদ্‌ব্যবহার করা হয়। এখন প্রশ্ন এই :—এই অতিরিক্ত কামশক্তির প্রকৃত সদ্‌ব্যবহার কি? (যে জন্য 'the energy of sex is created in much greater quantity than is necessary for the continance of life'.) উস্পেন্স্কি বলেন—to curb sex-energy and utilise it *in the interests of inner evolution*—that is, the evolution of man into superman, his development in the direction of the acquisition by him of higher consciousness and the opening up of his latent forces and faculties অর্থাৎ অতিরিক্ত কামশক্তির তখনই সদ্ব্যবহার করা হয়, যখন উহাকে সংযত করিয়া বিবর্ত্তনের উচ্চ প্রয়োজনে,

মানুষের মধ্যে অব্যক্ত শক্তি ও সম্ভাবনার বিস্ফুরণে, মানুষের সম্বিৎকে উচ্চতর ভূমিকায় উত্তোলনে—এক কথায় মানবের অতিমানবে বিকাশসাধনে প্রযুক্ত করা হয়। যাহারা ঐরূপ করিতে পারেন তাঁহারাই যৌনাতীত—উস্পেন্স্কি যাহাকে 'Supra-sex' বলিয়াছেন। তিনি যাহাকে 'supra sex' বলিলেন, আমরা এ দেশে তাহাকে 'অপ্রাকৃত কাম' বলি—'বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত মদনমোহন'। ইহারই নাম কাম-বিজয়, মন্মথ-মন্মথ হওয়া—'সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথঃ'—'মন্মথের মন মথে' (চরিতামৃত)।

প্রাকৃত কাম=Normal Sex। ঐ অ-প্রাকৃত কাম=Super-normal বা অতি-প্রাকৃত Sex (supra-sex)। তা' ছাড়া আর এক প্রকার কাম দেখা যায়, যাহাকে abnormal বা উন-প্রাকৃত কাম বলা যাইতে পারে। কামের এই বিকৃত, বীভৎস, বিপরীত রূপকে অধ্যাপক উস্পেন্স্কি 'Infra sex' বলিয়াছেন এবং ঐ উনপ্রাকৃত কাম হইতে প্রাকৃত, বিশেষতঃ অপ্রাকৃত কামের বৈরূপ্য বুঝাইবার জন্য অনেক কথার অবতারণা করিয়াছেন। কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য বটে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাহার সবিস্তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। 'অপ্রাকৃত' কাম (super sex) বুঝিবার জন্য যেটুকু দরকার আমরা মাত্র তাহারই উল্লেখ করিব।

প্রকৃত কথা এই, অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত কামে (supra sexএ) প্রাকৃত ও উনপ্রাকৃত—উভয়বিধ কামই অবসিত, তিরোহিত, উন্নীত হইয়া উচ্চতর ভূমিকায় প্রেমে পরিণত হয়—'where everything that is determined first as infra-sex and second as normal sex is *eliminated*'—'where sex sensations *disappear* in the light of mystical experiences.'

ঐ যে Infra-sex বা উন-প্রাকৃত কাম, উস্পেন্স্কি বলেন উহার স্বালক্ষণ্য (characteristic) এই :

Arrested development or degeneration, sometimes accompanied by a strengthening and an exaggerated development of sex desires and sex sensations.

ঐ Infra-sexএর কুৎসিত, কদাকার জুগুপ্সিত মূর্ত্তি আমাদের সকলেরই পরিচিত।

In its several forms, from impotence to homo-sexuality or unnatural inclinations......sex abnormalities, all perversions including abnormal sex desires or abnormal abstinence, disgust of sex, fear of sex, indifference to sex, interest in one's own sex —sometimes bordering on manias and phobias, that is, on pathological proclivities and pathological fears.

সময় সময় ঐ Infra-sex ভীষণ ও ভয়ানক মূর্ত্তিতেও দেখা দেয়, যেমন ইডিপাসে ও ওথেলোতে—

When all emotions belonging to sex become inevitably connected with irritation, suspicion and jealousy and seek to avenge 'outraged honor' or 'injured feelings' by committing murders or other crimes—thus having resemblance to delusional insanity or homocidal mania.

প্রাকৃত কাম কিন্তু সহজ স্বচ্ছন্দ নিরাপদ ব্যাপার; ইহাতে উন-প্রাকৃতের ঝঞ্ঝাবাত বজ্রাঘাত নাই। সংযমের সীমা অতিক্রম না করিলে উহার সহিত অন্যান্য মানসিক বৃত্তি ও ব্যাপারের অসামঞ্জস্যও ঘটে না।

For *normal* man, sex contains no danger. In a normal human being, sex harmonises with all other functions, including the emotional and the intellectual. There is no antagonism between sex and other functions, as in infra-sex, where there is constant disharmony between sex and the other sides of inner life. (In normal sex) there is no inner discord between sex and other functions, especially intellectual or higher emotional functions, as is the case in infra-sex.

প্রাকৃত কামের নিকট যৌনসম্বন্ধ সাহজিক ব্যাপার; উহার মধ্যে যেমন বিস্ময় নাই, তেমনি বিদ্রূপও নাই।

With regard to normal sex, there is no laughter in it. The function of sex can not be comic, it can not be an object of joke.

উন-প্রাকৃত কাম ইহার ঠিক বিপরীত।

It derides sex, takes it as a joke, tries to find something *comic* in it.

ইহার ফলে একরূপ অধম কলার সৃষ্টি হয়—যাহার নাম Pornography। প্রাকৃত কামের সহকারী সুকুমার কলা (Erotic Art) ভিন্ন

প্রকৃতির—প্রাচীন গ্রীস, রোম, ও ভারতবর্ষে ঐ কলার সুষমা প্রত্যক্ষ করা যায়। ঐ কলায় ও Pornographyতে আকাশ পাতাল ভেদ।

Infra-sex gives rise to a kind of pseudo-art, which is of course quite different from erotic art, as in the Greek and Roman worlds and in ancient India.

উন-প্রাকৃত কাম (Infra-sex) কখনও কখনও ধর্ম্ম বা নীতির ছদ্মবেশ পরিয়া দেখা দেয়, কিন্তু একটু অনুধাবন করিলেই তাহার স্ব-রূপ ধরা পড়ে; তখন বুঝা যায় 'it is pseudo-morality and pseudo saintliness.' ঐ ভাবে নারীমাত্রেই নরকস্য দ্বারং এবং 'স্বাঙ্গ-জুগুপ্সা'ই শুচিতার চরম। এ প্রসঙ্গে উস্‌পেন্‌স্কি বলিয়াছেন—

With people of infra sex, woman is the instrument of the devil and man is the tempter. With them, thc ideal of 'purity' is sexual impotence, infantile, senile or pathological......It is very characteristic that infra-sex continually holds in suspicion and mercilessly condemns normal sex and its manifestations, while it finds an excuse for people of 'intermediate sex' as well as for various abnormal means of sexual satisfaction...... People of this group are coloured by the psychology of the 'lupanar'—in which sex is connected with what is lowest in man and is surrounded with an atmosphere of uncleanliness, in which mud is thrown on sex. Having taken infra sex for supra sex, people have begun to regard normal sex from the stand point of infra sex, as something anomalous, unclean, hindering the salvation or the liberation of man.

প্রাকৃত ও উন-প্রাকৃত কাম সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হইল। এইবার অ-প্রাকৃত কামের পরিচয় দিবার চেষ্টা করি।

উন-প্রাকৃত কামের aberrations ছাড়িয়া দিয়া যদি প্রাকৃত কামের সাহজিক ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়, তবে দেখিতে পাই অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃতি-দত্ত কাম-শক্তির অন্যায় অপচয় করা হয়—it is wasted unproductively in ordinary life (Ouspensky)। ঐ অপচয়ের নিন্দা আমরা এদেশে নানা ছন্দে শুনিয়াছি—

মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দু-ধারণাৎ।

চৈনিক যোগ-দীপিকা 'আই চিনে'রও ঐ কথা—The fool wastes the most precious jewel of his body in uncontrolled pleasure, and does not know how to conserve the power of his seed. অথচ ঐ শক্তির সদ্‌ব্যবহার করিবার সম্ভাবনা ও যোগ্যতা নিসর্গ আমাদের হাতে পূর্ণ মাত্রাতেই দিয়াছেন। ঐ সদ্‌ব্যবহার কি ?

The utilisation of this energy, which is wasted unproductively in ordinary life, creates in a man's soul the force which leads to the *super-human*. (Ouspensky) The seed that is conserved is transformed into power, and the power, when there is enough of it, makes the creatively *strong* body (I'chin).—অর্থাৎ যাহাকে যোগের পরিভাষায় 'কায়সম্পদ্' বলে। কায়সম্পদ্ কি ?

রূপলাবণ্য-বজ্রসংহননত্বানি কায়সম্পৎ—যোগসূত্র, ৩।৪৬

দেহ বজ্রের মত দৃঢ় হয়—কেবল তাহাই নহে, তখন শরীর হইতে একটা ছটা (লাবণ্য) বিচ্ছুরিত হয়। ইহাকেই রেতঃকে ওজে পরিণত করা বলে—the sublimation of the seed into power. উস্‌পেন্‌স্কি ইহার নাম দিয়াছেন 'Transmutation, that is the transformation of the sex energy into energy of a high order.' চৈনিক যোগদীপিকা ইহাকেই 'the backward-flowing method বলিয়াছেন—

If it is not allowed to flow outward but is led back by the force of thought, so that it penetrates the crucible of the creative and refreshes heart and body and nourishes them, that also is the backward-flowing method. Therefore it is said: The meaning of the Elixir of life depends entirely on the backward-flowing method.

ইহাকেই এ দেশে 'উর্দ্ধ-রেতাঃ' হওয়া বলে। মানব স্বভাবতঃ অর্ব্বাক্‌-স্রোতঃ (outward-flowing); তাহার পক্ষে উর্দ্ধ-স্রোতঃ হওয়ার অর্থ অতিমানব হওয়া। পৌরুষ, প্রযত্ন, উদ্যম, উদ্‌যোগ—এক কথায় যোগ-প্রণালী দ্বারা এ অসাধ্য সাধন সিদ্ধ করিতে হয়।

As to the third aim of nature, viz evolution of man towards superman, it requires *conscious* action on the part of the man himself—the intentional use of sex energy for the purposes of inner evolution.

প্রশ্ন হইবে উর্দ্ধ-রেতাঃ হওয়া সম্ভব কিনা ? যাহাকে Backward-flowing method বলা হইল, সেই Transmutation (রেতঃকে ওজে পরিণত করা) বিজ্ঞান-সিদ্ধ কি না ? উস্‌পেন্‌স্কি বলেন—

This idea of transmutation is much nearer to *modern* scientific thought than might be supposed, and is supported by the new science of *endocrenology* or the study of the glands of internal secretion.

কিরূপে ? বিষয়টা বুঝিতে হইলে যাহাকে গ্ল্যাণ্ড (gland) বা গণ্ড বলে, তৎসম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিকভাবে মানুষের শরীর পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, ঐ শরীরে তিন জাতীয় গণ্ড বা gland আছে—প্রথম বহিঃস্রাবী গণ্ড (glands with only external secretions)—যাহাদের ক্ষরণ বহির্মুখ—যেমন salivary glands, tear glands, nasal glands, kidney (লালা-নিঃস্রাবী, অশ্রুনিঃস্রাবী, কফনিঃস্রাবী, পিত্তনিঃস্রাবী গণ্ড)। দ্বিতীয় অন্তঃস্রাবী গণ্ড—যাহাদের ক্ষরণ অন্তর্মুখ—যাহাদিগকে endocrine বা ductless glands বলে (with only internal secretions)—যেমন thyroid gland, pineal gland, pituitary body 'which is visualised as leader of the endocrine system'। এবং তৃতীয় উভস্রাবী গণ্ড—যাহাদিগের ক্ষরণ উভয়মুখ—অন্তঃ ও বহিঃ অর্থাৎ glands of both internal and external secretions। এই উভস্রাবী গণ্ডের মধ্যে প্রধান—যৌনগণ্ড (sexual glands)—বীজ-কোষ, জরায়ু প্রভৃতি। It is established by physiology that the sex glands are at the same time glands of external and of internal secretion.

যৌনগণ্ডের বহিঃক্ষরণ আমাদের সুপরিচিত কিন্তু উহার যে অন্তঃক্ষরণ আছে এবং ঐ ক্ষরণ দ্বারা যে নিসর্গের নিগূঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধ হয়, ইহা হয়ত আমরা অনেকে জানিনা। উস্‌পেনস্কি বলিতেছেন :—

The internal secretion of the sex glands is the chief factor in creating and regulatiug the development of secondary sexual characters. To such an extent is this so that in the case of injured sex glands or in the case of castration, when internal secretion ceases or is impaired, secondary characters disappear or become modified, and a man becomes a degenerate type of infra sex.

গত ৮০ বৎসর ধরিয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা গণ্ডতত্ত্ব, বিশেষতঃ অন্তঃস্রাবী গণ্ড লইয়া অনেক আলোচনা গবেষণা করিয়াছেন—তাহার ফলে দেহ-বিজ্ঞানের এক নূতন বিভাগ (Endocrinology) ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। এ আলোচনার সূত্রপাত করেন Claude Bernard। পরে Addison, Brown-Sequard—বিশেষতঃ নিউইয়র্কের ডাঃ বার্‌ম্যান (Berman) ঐ সূচনায় অনেক নূতন তথ্য সংযোগ করিয়াছেন। উস্‌পেন্‌স্কি সমাদরের সহিত ডাঃ বার্‌ম্যানের The Glands regulating Personality ও The Personal Equation গ্রন্থদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিমাদের যাহা স্বভাব—স্বভাবো মূর্দ্ধ্নি বর্ত্ততে—কোন নূতন সত্যের সন্ধান পাইলে, তাঁহারা তাহার প্রাণান্ত না করিয়া ছাড়িবার পাত্র নন—গণ্ডতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে।* নেপোলিয়ন যে ওয়াটার্‌লু যুদ্ধে পরাজিত হন, তাহার হেতু তাঁহার pituitary glandএর স্তিমিত ক্ষরণ !

Thus Dr. Bernam explains all the failures of Napoleon's last campaigns, ending in the catastrophe of Waterloo, by the weakening of the secretions of the pituitary gland.

* According to the data of endocrinology, all the physical properties and functions of man ; growth, nourishment, structure of the body, functioning of different organs, and also all the psychic life, intellectual and emotional, the whole psychic make-up of a man, his activity, his energy, his strength—all this depends on the properties and on the character of the activity of the glands of internal secretion, which produce motive-power for the working of the organs, the nervous system, the brain, and so on.

অর্থাৎ মানুষ গণ্ডস্রাবের হস্তে যন্ত্রারূঢ় ক্রীড়নক—'a marionette controlled by glandular secretions !'

যে যাহা হ'ক, আমরা যৌনগণ্ডের (sexual glandsএর) আলোচনায় ফিরিয়া যাই এবং দেখি উর্দ্ধস্রোতা সম্বন্ধে তদ্দ্বারা কিছু নূতন আলোক পাই কিনা ?

যৌন গণ্ডের অন্তঃক্ষরণের বিষয় (internal secretion) আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ঐ ক্ষরণের উদ্দেশ্য ও ফলও আলোচিত হইয়াছে। উস্‌পেন্‌স্কি বলেন ঐ ব্যাপারে আমরা রেতের ওজে ঐকদেশিক পরিণতি লক্ষ্য করিতে পারি।

The internal secretion of the sex-glands is the *transmutation* already recognised by Science. The normal life of the organism and the conservation of secondary characters depend on this transmutation.

এই পরিণতি যদি আর এক গ্রাম উর্দ্ধে উঠাইতে পারি অর্থাৎ যদি যৌনগণ্ডের ক্ষরণকে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখ করিতে পারি, তাহা হইলেই যোগের অনুমোদিত backward-flowing method বা উর্দ্ধরেতা হওয়ার প্রণালীতে উপনীত হই।

In the process of evolution sex energy, as it were, turns inward within the organism and creates in it a new life, capable of ever new, of eternal regeneration.

উস্‌পেন্‌স্কি আরও বলিতেছেন :—

The esoteric idea differs from the modern scientific view only in the admission of the possibility of the transmutation being increased and brought to a degree of totally incomprehensible and unknown intensity, which creates a new type of man (that is the type of man belonging to supra-sex).

ইহাই যৌনাতীত হওয়া। উস্‌পেন্‌স্কি বলেন, বিজ্ঞানের পক্ষে ইহা নূতন কথা বটে কিন্তু প্রজ্ঞান বা অধ্যাত্ম বিদ্যার কাছে ইহা অপরিচিত নহে। All this is new for modern thought but in reality approaching the esoteric more and more nearly.

ইহার পর উস্‌পেন্‌স্কি একটি জটিল সমস্যা উপস্থিত করিয়াছেন। এই যে Transmutation (রেতের ওজে পরিণয়ন)—ইহা কি কাম অঙ্গীকার করিয়া না কাম প্রত্যাহার করিয়া? ইহা কি কামের বর্জ্জনে না কামের যোজনে সাধন করিতে হইবে—'in opposition to sex or through sex'?

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ঐ সাধনা কাম-সংযুক্ত কি কাম-বিযুক্ত হইবে তাহা সাধনকারীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে।

(1) There are types of people for whom the attainment of supra sex is possible only through a struggle against sex and (2) there are other types of people for whom the attainment of supra sex is possible without the struggle against sex. (Ouspensky)

রাজযোগের পথ—বুদ্ধদেব, যিশুখৃষ্ট প্রভৃতি যে পথ প্রদর্শন ও যে পথে বিচরণ করিয়াছেন—সে ঐ প্রথম পথ। এ পথ কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের পথ (complete sex abstinence and asceticism)। রাজ-যোগের ভিত্তিভূমি যম-নিয়ম এবং পঞ্চ যমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যই মুখ্য।

অহিংসা-সত্য-অস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্য-অপরিগ্রহাঃ যমাঃ

—যোগসূত্র, ২।৩০

কারণ, ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে বীর্য্যলাভ অসম্ভব—ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ (২।৩৮ সূত্র)। বুদ্ধ-শাসনে দেখিতে পাই, যাঁহারা গৃহস্থ (শ্রাবক), স্বদার-সেবা তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ না হইলেও, যাঁহারা শ্রমণ (প্রব্রজ্যাবলম্বী) কামচর্চ্চা তাঁহাদের পক্ষে একেবারে বর্জ্জনীয়। তাঁহাদের জন্য বিধি—complete abstinence। কারণ, 'the point of view is that sex life is a hindrance to the salvation of man'।

যিশুখৃষ্ট বলিতেন, কামক্রিয়া ত' দূরের কথা, যদি কামিনীর প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত কর, তবেও তুমি পতিত হইবে—who looks after a woman to lust with her, has already committed adultery in his heart। তাঁহার কঠোর অনুশাসন পাঠকের স্মরণে আসিবে—

For there are some eunuchs, which were so born from their mother's womb, and there are some eunuchs which were made eunuchs of men, and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it. (Matt. 19,12),—অর্থাৎ

স্ত্রী হিজ্‌ড়ে, পুরুষ খোজা,
তারাই ধরে ধর্ম্মের ধ্বজা।

অপর পক্ষে সহজিয়া ও পঞ্চমকার সাধক তান্ত্রিকের যে পথ—those who admit the possibility of the transmutation of sex-energy in conditions of normal sex life and normal expenditure of sex energy—ডাক ডাকিনীরা এবং জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণ যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন—সে পথ ঐ দ্বিতীয় পথ। ঐ পথে 'প্রকৃতি', সাধনের প্রধান সহায়। ডাকার্ণব বলেন—

রম রম পরম মহাসুখ বজ্জু।
প্রজ্ঞোপায়ই সিজ্জউ কজ্জু॥ বৌদ্ধগান ও দোঁহা, ১৬১ পৃষ্ঠা

'রমণই পরম মহাসুখ—ইহাই প্রজ্ঞার উপায়, ইহা হইতেই সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি।'

সহজাচার্য্য গুণ্ডরী-পাদের উক্তি এই—

জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি॥

'হে যোগিনী! তোমা বিনা একক্ষণও রহিতে নারি। তোমার মুখ চুম্বিয়া কমল-রস পান করি।'

আর একজন সহজিয়া কৃষ্ণপাদের আকাঙ্ক্ষা এই—

আলো ডোম্বি! তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।
নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাগ॥

'ওলো ডোমি! তোর সাথে আমি সাঙ্গাতি করিব। কাহ্ন (কৃষ্ণপাদ) নির্ঘৃণ কাপালিক—এই তাহার 'লাগ'।' সহজিয়ারা বলেন—সহজপথই এক মাত্র পথ—যদি ভববন্ধ খণ্ডন করিতে চাও—তবে 'সইপর রজ্জহ'।

অরে বট! (মূঢ়) সহজ সইপর রজ্জহ।
মা ভববন্ধগন্ধ পড়ি বজ্জহ॥

ইহাই সুরনদী-যমুনা, ইহাই গঙ্গাসাগর, ইহাই কাশীপ্রয়াগ, ইহাই চন্দ্রসূর্য্য।

এথুসে সুরসরি জমুনা, এথুসে গঙ্গাসাঅরু।
এথু পআগ বণারসি, এথুসে চন্দ দিআ-অরু ॥

এক শ্রেণীর বৈষ্ণব সাধক এই সহজিয়া ভাবে ভাবিত। সেইজন্য জয়দেবের "বিলাস কলাসু কুতূহলম্", সেইজন্য জয়দেব নিজের বিশেষণ দিয়াছেন—'পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবর্ত্তী'—'শ্রীজয়দেবে কৃতরতি (?) সেবে'। সেইজন্য চণ্ডীদাসের রজকিনী রামী—'রজকিনী প্রেম, যেন কাঁচা হেম'। সেইজন্য বিদ্যাপতির পক্ষে শিবসিংহের রাণী 'লছিমা দেবী পরমাণ'।

তান্ত্রিকের যে পঞ্চমকার—মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা মৈথুন—এ পঞ্চকের মধ্যে পঞ্চম মৈথুনই প্রধান।

বিনা শক্তিং ন পূজাস্তি মৎস্যমাংসং বিনা প্রিয়ে।
মুদ্রাঞ্চ মৈথুনঞ্চাপি বিনা নৈব প্রপূজয়েৎ ॥

* * *

কণ্ঠে কণ্ঠং মুখে বক্ত্রং বক্ষোজং চোরসি প্রিয়ে!
তস্যৈ কুলরসং দেবি! পায়য়িত্বা যথোচিতম্।
স্বয়ং পীত্বা জপেৎ মন্ত্রং সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা ॥

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এ সকল ব্যাপার কেবল কামুকতা ও ব্যভিচার নহে—ভিত্তি ইহার ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়োজিত।

বিলিখ্য ভুবি দেবেশি! তত্র কান্তাং সমানয়েৎ।
তদ্‌গাত্রে পূজয়েৎ দেবীং নানাভরণসংযুতাম্।
নিশীথে তু জপেৎ মন্ত্রং একান্তে কান্তয়া সহ ॥

* * *

লেপয়েৎ দিব্য গন্ধেন ভূষণৈর্ভূষয়েৎ স্বয়ং।
রময়েৎ পরয়া ভক্ত্যা সাধকঃ সিদ্ধি-হেতবে ॥

এই শ্রেণীর সাধকেরা 'saw the way to transmutation, not in opposition to sex but through sex.

শুধু ভারতবর্ষের সহজিয়া ধর্ম্মে এবং তান্ত্রিক সাধনায় ও যোনিলিঙ্গ-পূজায় নহে—উস্‌পেন্‌স্কি বলেন এ প্রণালীর ধর্ম্মসাধন বহুবিস্তৃত ও ব্যাপক ছিল।

To this category belong those forms of religious understanding, in which sex is regarded as an expression of the Deity in man and is an object of worship, as in the religions of Greece and Rome and the ancient cults of Crete, Asia and Egypt.

কামনদীতে অবগাহন করিয়া কাম-জয় কিরূপে সম্ভব, তাহার ধারণা করা কঠিন। প্রাচীনেরা বলিয়াছেন ঃ—

ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥

কামের উপভোগ দ্বারা কখনও কাম নিবৃত্ত হয় না—পরন্তু ঘৃতভোজী অগ্নির ন্যায় আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। আরও দেখুন বাসনার ত' ইয়ত্তা নাই—'It grows by what it feeds upon.'

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তস্মাদ্ অতিতৃষ্ণং ত্যজেৎ ॥

'এই ভূমণ্ডলে যত কিছু ভোগ্যবস্তু আছে—ধান্য, হিরণ্য, পশু, রমণী—বাসনা এমনই বিশ্বভুক্ যে, সে সমস্তই একটি প্রাণীর জন্যও পর্য্যাপ্ত নয়—অতএব 'কামিনী কাঞ্চন' বর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ।' শুনা যায় বিষস্য বিষম্ ঔষধম্—তান্ত্রিক সাধকের পঞ্চম মকার-সাধন এবং সহজিয়ার 'প্রকৃতি'-সম্ভাষণ কি সেই ধরণের 'সদৃশ' চিকিৎসা? Similia similibus curanter.

সে যাহা হ'ক, এ কথা নিঃসংশয়, 'প্রকৃতি'কে দ্বার করিয়া সাধন অপেক্ষা কামবিজয়ের একটা প্রকৃষ্টতর পন্থা আছে—সে প্রণালীতে 'জহরকা পুরিয়া' গ্রাস করিতে হয় না, বিষকে অমৃতে রূপান্তরিত করা যায়—অমৃতং বা বিষম্ ঈশ্বরেচ্ছয়া। সে প্রণালী ভগবানে কামার্পণ—তাঁহাকে প্রিয়তম—প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ জানিয়া, তাঁহাকে কান্তভাবে ভজন—চৈতন্য মহাপ্রভু গোপীভাবের অনুকরণ করিয়া যে প্রণালী 'আপনি আচরি ধর্ম্ম' অপরকে শিখাইয়াছিলেন।

বাইবেলের 'Song of Solomon'এ—

Let him kiss me with the kisses of his mouth, For thy love is better than wine......Behold thou art fair, my beloved,

yea pleasant—also our bed is green……His left hand is under my head—and his right hand doth embrace me……By night on my bed—I sought him, whom my soul loveth; I sought him, but I found him not.

সুফিদিগের সাকী ও পেয়ালার অন্তরালে—

অতীত যা' তার দুখের স্মৃতি, ভবিষ্যতের ভাবনা ঘোর—
দিল্-পিয়ারা সাকী! গো আজ পেয়ালা ভ'রে ঘুচাও মোর
* * * *
এক লহমা সময় আছে, সর্ব্বনাশের মধ্যে তোর—
ভোগ-সায়রে ডুব দিয়ে কর্ একটা নিমেষ নেশায় ভোর!
—ওমরখৈয়াম (শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ)

—বিশেষতঃ রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জক্রীড়ার রূপকের মধ্যে ঐ কান্তভাবে ভজনের উজ্জ্বল রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। ঐরূপ ভজনকারীর নিকট নর-নারীর প্রাকৃত ভেদ তিরোহিত হয়। তাঁহার অপ্রাকৃত কাম বা প্রেম-দৃষ্টিতে এ ভব-বৃন্দাবনে (মীরা বাইয়ের ভাষায়) শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ—আর সকলেই প্রকৃতি হইয়া যায়। *

প্রকৃতি ত পুরুষকেই চায়—পুরুষের সহিতই 'সঙ্গম' বাঞ্ছা করে—অতএব সেই 'মহান্ বৈ পুরুষঃ' ভগবানে কামার্পণ ভিন্ন তাহার গত্যন্তর কি? এ ভজনে কামের বর্জ্জন করিতে হয় না—শোধন করিতে হয়—suppression করিতে হয় না, sublimation করিতে হয়।

অনুধাবন করিলে, এ প্রণালীর ভজনের একটা গভীর আধ্যাত্মিক ভিত্তি ধরিতে পারা যায়। উস্পেন্স্কি ঠিকই বলিয়াছেন, of all ordinary human experiences, only sex sensations approach those which we call mystical.

* If thy soul is to go into higher spiritual blessedness, it must become woman—yes, however manly you may be among men. (F. W. Newman)। এখানেও type-ভেদ লক্ষ্য করা যায়। এক শ্রেণীর সাধক (Psycho-analysisএর ভাষায় যাঁহারা চণ্ডীদাস-complexএর লোক) 'প্রকৃতি'কে দ্বার করিয়া সাধনা করেন এবং সিদ্ধ হ'ন—অপর শ্রেণীর সাধক (যাঁহারা চৈতন্য-complexএর লোক) তাঁহারা নিজকে 'প্রকৃতি' করিয়া 'উত্তম পুরুষ' ভগবানে কামার্পণ করিয়া কাম বিজয় করেন।

সেইজন্য প্রাচীনেরা রতিসুখকে 'ব্রহ্মানন্দ-সহোদর' বলিতেন। উপনিষদের নিম্নোক্ত উপমারও সার্থকতা ওই—

স যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্
এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যং
কিঞ্চ বেদ নান্তরম্—বৃহদারণ্যক, ৪।৩।২১

'যেমন প্রিয়া রমণী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য অন্তর কিছুই জ্ঞান থাকে না—তেমনি এই পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া বাহ্য-অন্তর কিছুই জানে না।'

Of all we know in life, only in love is there a taste of the mystical, a taste of ecstacy. Nothing else in our life brings us so near to the limit of human possibilities, beyond which begins the unknown. And in this lies without doubt the chief cause of the terrible power of sex over human life. (Ouspensky)

সেইজন্যই কামের প্রতিক্রিয়ায় এত অবসাদ, অবসানে এত নির্ব্বেদ।

In love and all sex sensations, there is a strange melancholy, and a strange sadness. The more a man feels, the stronger in him is this sensation of farewell, this sensation of parting.

কেন এমন হয়? উস্পেন্স্কি বলেন—

In a man (or woman) of strong feeling, sex sensations awaken certain new states of consciousness, new emotions. And these new emotions change emotions of sex, cause them to fade and disappear.

প্রাকৃত কাম ক্রিয়াতেই যখন এই সম্ভাবনা, তখন যাঁহারা ভগবানে কামার্পণ করিয়া প্রাকৃত কামকে প্রেমে বা অপ্রাকৃত কামে রূপান্তরিত করিয়াছেন, যাঁহারা যৌনাতীত (supra-sex) হইয়াছেন, তাঁহারা? Love, 'sex', these are but a foretaste of mystical sensations.………Consequently in true mysticism, there is no sacrifice of feeling. Mystical sensations are sensations of the same category as the sensations of love, only infinitely higher and more complex. (Ouspensky).

অতএব যিনি যৌনাতীত, যিনি অ-প্রাকৃতকামী, যিনি শ্রীরাধার মহাভাবে ভাবিত হইয়া সেই চির-সুন্দরে কামার্পণ করিয়া তাঁহাকে মধুরভাবে ভজন করেন, তাঁহার প্রাকৃত কামানন্দ যে অপ্রাকৃত ভূমানন্দে উল্লসিত হয়—তাঁহার যে 'But at the same time sex-sensations disappear in the light of mystical experiences'—ইহার ধারণা কঠিন নয়। কিন্তু সে অনুভূতির বর্ণনা ?

সখিরে ! কি পুছসি অনুভব মোয় ?
সোইক পীরিতি, অনুরাগ বাখানিতে
নিতি নিতি নূতন হোয়।

'There always remains in it an element of the miraculous and the impossible. And there is no fading of his own feeling.' 'This is the new consciousness, for the definition and description of which there are no words.'

সেইজন্য নারদ ইহাকে 'মূকাস্বাদনবৎ' বলিয়াছেন। বৈষ্ণব কবির বর্ণনা আরও হৃদয়গ্রাহী—

কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইনু
না বুঝনু কৈছন কেল
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল !

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

মাছি

(ক্যাথ্‌রিন্‌ ম্যান্‌সফিল্‌ডএর "দি ফ্লাই" হইতে)

অফিসের কর্ত্তা ছিলেন বুড়ো উড্‌ফিল্‌ডের পুরাণো বন্ধু। তাঁরই ডেস্কের পাশে একখানি সবুজ চাম্‌ড়ায় মোড়া, হাতল-দেওয়া চেয়ারে সে বসেছিল। ছোট ছেলেরা যেমন ঠেলাগাড়ীর ভিতর থেকে উঁকি মারে, বুড়ো উড্‌ফিল্‌ড তা'র প্রশস্ত চেয়ারখানি থেকে ঝুঁকে পড়ে বল্‌লে, "তা' তুমি এ ঘরটাতে বেশ আরামে আছ কিন্তু !"

তা'র কথাবার্ত্তা শেষ হ'য়ে গিছ্‌ল ; এইবার তার বিদায় নেবার সময়। কিন্তু আসলে তা'র যাবার ইচ্ছা ছিল না। কর্ম্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ কর্‌বার পরে যখন্‌ তার হঠাৎ স্বাস্থ্যভঙ্গ হোল, তা'র পর থেকেই তা'র স্ত্রী ও মেয়েরা তাকে কড়া নিয়মে বেঁধে ফেলেছিল। সপ্তাহের মধ্যে সব কয়দিন সে বাড়ীর মধ্যে-ই আবদ্ধ থাক্‌ত, কেবল একটি দিন ছাড়া। মঙ্গলবারে সে ছুটি পেত। ঐ দিনটাতে সে যথারীতি ভদ্রবেশে সজ্জিত হ'য়ে সহরে যাবার অনুমতি পেত। অবশ্য সহরে গিয়ে সে কী করত, সেটা তার স্ত্রী ও কন্যারা কেউই ভেবে ঠিক্‌ করতে পার্‌ত না। বোধ করি, সেখানে গিয়ে বন্ধু বান্ধবদের বিরক্তি উৎপাদন কর্‌ত। হয়ত বা তাই। কিন্তু তাকে দোষ দেওয়া যায় না। পতনোন্মুখ শেষ কয়টী পল্লবের প্রতি গাছের যেরূপ নিবিড় অথচ স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে, জীবনের মেয়াদ্‌ ফুরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শেষ গুটী কয়েক আনন্দ-উপাদানের উপর মানুষের মনে সেই রকম গভীর মমতা আপনা হ'তেই জন্মে ওঠে।

চুরুট খেতে খেতে বুড়ো উড্‌ফিল্‌ড বন্ধুর দিকে উৎসুক নয়নে তাকিয়েছিল। অফিসের কর্ত্তা বসেছিলেন তাঁর নিজস্ব আসনটাতে। তার চেয়ে বয়সে বছর পাঁচেকের বড়ই হবেন, কিন্তু দিব্যি নধরকান্তি। স্বাস্থ্য এখনও অটুট্‌ এবং অফিসের সকল কাজেই তিনি কর্ণধার বিশেষ। মানুষটীর দিকে খানিকক্ষণ চাইলে মনে আপনি উৎসাহ আসে।

বৃদ্ধ বল্‌লে, "সত্যি, এ যায়গাটাতে তুমি দিব্যি আরামে আছ।" চোখে তার উজ্জ্বল, প্রশংসমান দৃষ্টি।

কর্ত্তা কাগজ-কাটা ছুরী দিয়ে টাইমস্ পত্রিকাখানি কাটতে কাটতে বল্‌লেন, "কথাটা সত্যি বটে।" প্রকৃতপক্ষে এই নিজস্ব ঘরটী ছিল তাঁর কাছে অহঙ্কারের বস্তু। তিনি চাইতেন যে পাঁচজনে, বিশেষ ক'রে উড্‌ফিল্‌ড এই ঘরটীর তারিফ্ করে, গলাবন্ধ-জড়ানো এই ক্ষীণ ও ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধটীর চোখের সাম্‌নে নিজের ঘরটীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে তাঁর মনে বিশেষ রকমের আত্মপ্রসাদ ফুটে উঠ্‌ত।

গত কয় সপ্তাহ ধ'রে যেমন আর সবাইকে শুনিয়েছেন, তেম্‌নি স্বরে বন্ধুকে বল্‌লেন, "ঘরটায় সম্প্রতি কিছু অদল-বদল করানো গেছে হে!" বড় বড় সাদা গোল দাগ-দেওয়া ঘোর লাল গাল্‌চেটার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বল্‌লেন, "এটা নতুন কিনেছি।" টেবিলটার দিকে একটু শিরঃকম্পন ক'রে বল্‌লেন, "এসব নতুন আস্‌বাব।" দূরে তামার বাসনে পাঁচটী মুক্তাস্বচ্ছ সসেজ্ রাখা ছিল সেই দিকে পরম উৎসাহ-ভরে হাত নেড়ে জানালেন, "আর ওটা হোল গরম কর্‌বার বৈদ্যুতিক প্রণালী।"

কিন্তু একটা জিনিষের প্রতি তিনি উড্‌ফিল্‌ডের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌লেন না। যেটা তিনি কৌশলে এড়িয়ে গেলেন, সেটা হ'ল টেবিলের উপর সযত্ন-রক্ষিত একখানি ফটোগ্রাফ্। ছবিখানি একটী যুবকের প্রতিকৃতি। পরনে তার খাকী পোষাক, আর মুখে কেমন একটা বিসদৃশ গম্ভীর ভাব। ছেলেটীর পিছনদিকে সেই আদিকালের আলোকচিত্রের পটভূমিকা, আর মাথার উপরে ঘনিয়ে-ওঠা মামুলী মেঘের রাশি। ছবিখানি নূতন নয়; আজ ছয়বৎসর হ'ল ঐ জায়গাটীতে বসানো রয়েছে।

বৃদ্ধ উড্‌ফিল্‌ড বল্‌লে, "দেখো, তোমায় একটা কথা বল্‌বার ছিল।" এই ব'লে সে একটু থাম্‌ল। স্মরণ কর্‌বার ব্যর্থ চেষ্টায় তার চোখ অশ্রু-সজল হয়ে এল।

"এই দেখো! কি বল্‌তে যাচ্ছিলাম,—এখন আর কিছুতেই মনে আন্‌তে পারছিনা। অথচ কী আশ্চর্য্য! সকালে যখন বাড়ী থেকে বেরোই, ঐ কথাটাই তোমায় বল্‌ব ব'লে মনে মনে ঠিক্ ক'রে রেখেছিলাম।

সহসা তার হাত কেঁপে গেল। কথার অসঙ্গতির জন্য গণ্ডদেশে রক্তোচ্ছ্বাস পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌ল।

কর্ত্তা ভাব্‌লেন, আহা বেচারী! ওর দেহমন দেখ্‌ছি সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। তাঁর হৃদয় বন্ধুর প্রতি সমবেদনায় ভ'রে গেল। তার দিকে একটু কৌতুকভরে তাকিয়ে বল্‌লেন, "দেখ, তোমার এখন কি দরকার জানো? আমার কাছে এমন একটা ওষুধ আছে, তার কয়েক ফোঁটা পেটে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌বে। বাইরের এই কন্‌কনে শীত তোমার অঙ্গস্পর্শ কর্‌তে পার্‌বেনা। সত্যি এতো ভাল জিনিষ যে মুখে বল্‌বার নয়। সেবনের ফল একেবারে নির্দ্দোষ, এতে ছোট ছেলেটীর পর্য্যন্ত কোনও ক্ষতি হয় না।"

এই ব'লে তিনি নিজের ঘড়ির চেন্ থেকে একটী ছোট্ট চাবী বা'র ক'রে ডেস্কের তলাকার একটা দেরাজ খুল্‌লেন। তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটী কালো রঙের ছোট চ্যাপটা বোতল।

"এই হ'ল তোমার সেই ওষুধ। যে লোকটী আমায় এনে দিয়েছিল, সে আমায় অতি গোপনে জানায় যে এ চীজ্ খাস্ উইণ্ড্‌সর প্রাসাদের ভাণ্ডারে এতদিন আত্মগোপন করে বাস কর্‌ছিল।"

এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে বুড়ো ত একেবারে অবাক্। কর্ত্তা যদি হঠাৎ একটা খরগোসের ছানা বা'র ক'রে তার সাম্‌নে ধর্‌তেন, তাতেও বোধ করি সে এতটা বিস্মিত হ'ত না। ক্ষীণ ও সন্দিগ্ধস্বরে সে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "হুইস্কী, না।"

কর্ত্তা সস্নেহে বোতলটী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মার্কা দেখালেন। হুইস্কীই বটে!

উড্‌ফিল্‌ড আবেগভরে বন্ধুকে বল্‌লে, "তুমি বল্‌লে বিশ্বাস কর্‌বে না ভাই, বাড়ীতে ও সব জিনিষ আমাকে ছুঁতে দেয় না।

তার কণ্ঠস্বর শুন্‌লে কথাটা অবিশ্বাস করা শক্ত। বৃদ্ধের বিগলিত মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছিল সে এইবার বুঝি কেঁদে ফেলে।

"ও কথা যখন তুল্‌লে, তখন বলি। এবিষয়ে মেয়েদের চেয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা সচরাচর আরও একটু গভীর হ'য়ে থাকে।" টেবিলের উপর দুটো বড় গেলাস রেখে কর্ত্তা সেগুলোতে বেশ খানিকটা ক'রে পানীয় ঢাল্‌লেন, তারপর একটা এগিয়ে দিলেন উড্‌ফিল্‌ডের দিকে।

"খেয়ে ফেলো দিকি! নিজেই পরখ্ ক'রে দেখো সত্যি উপকার হয় কিনা। আহা! তাই ব'লে জল মিশিয়োনা যেন! এমন খাঁটি ও দুর্লভ জিনিষের অপমান অমার্জ্জনীয়।" এই ব'লে এক নিঃশ্বাসে নিজের গেলাসটী শূন্য ক'রে রুমাল দিয়ে সযত্নে গোঁফ মুছে ফেল্‌লেন।

বুড়ো উড্‌ফিল্‌ড ততক্ষণে তারিয়ে তারিয়ে অমৃতস্বাদ গ্রহণ করছিল। কর্ত্তা তার দিকে চেয়ে একটু চোখ্ টিপ্‌লেন। বৃদ্ধ এইবার তা'র মুখস্থ তরল পদার্থটী গলাধঃকরণ কর্‌লে। অসহ্য পুলকে কিছুক্ষণ তা'র বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'লনা। তারপর অতি সংক্ষিপ্তভাবে বল্‌লে, "হুবহু বাদামের মত স্বাদ।" ততক্ষণে তা'র সমস্ত শরীরটা আরামপ্রদ উত্তাপে ছেয়ে গেছে। অনড় স্নায়ুগুলোর মধ্যে রক্তস্রোত সঞ্চালিত হবার ফলে খেই-হারাণো কথাটা আবার ফিরে এল। চেয়ারে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে সে বল্‌লে, "যাক, এবার মনে পড়েছে। শোনো, তোমার জান্‌বার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। আমার মেয়েরা গত সপ্তাহে গিয়েছিল বেল্‌জিয়মে বেড়াতে। উদ্দেশ্য ছিল রেজির সমাধি দেখ্‌তে যাবে। সেখানে ঘুরতে ঘুরতে তারা হঠাৎ এসে পড়ে তোমার ছেলের কবরের পাশে। অনুমান হ'ল তা'দের সমাধি দুটী খুবই কাছাকাছি।"

বৃদ্ধ একটু থাম্‌ল। কর্ত্তা কোনও জবাব দিলেন না। কেবল তাঁর চোখের পাতা ঈষৎ কেঁপে উঠ্‌ল। বোঝা গেল, তিনি অবহিত হ'য়ে শুনছেন।

"মেয়েরা বল্‌ছিল যে জায়গাটা অতি পরিপাটী। এমন যত্ন ক'রে রেখেছে যে চমৎকার, দেখ্‌লে তৃপ্তি হয়। স্বদেশেও বোধ হয় এতটা সম্ভব হ'ত না। তুমি বোধ হয় ওধারে যাওনি কখনো?"

কর্ত্তা তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌লেন, "মোটেই না।" নানা কারণে তাঁর যাওয়া ঘটে ওঠেনি। বৃদ্ধ ব'লে যেতে লাগ্‌ল, "গোরস্থানটা বেশ বিস্তৃত, অনেক মাইল-ব্যাপী। এতো পরিষ্কার যে সাজানো বাগান বল্‌লেও অত্যুক্তি হয়না। সব কবরের উপরই নানা রঙের ফুল গজিয়েছে। আর মধ্যে মধ্যে সুন্দর চওড়া রাস্তা…"তা'র বল্‌বার ধরণ থেকে অনুমান করা কঠিন নয় যে সুন্দর প্রশস্ত পথগুলির প্রতি তার বিশেষ মমতা আছে। কিছুক্ষণ বাক্যস্রোত

বন্ধ রইল। তারপর আবার বৃদ্ধের মুখ খুলে গেল, "তুমি শুন্‌লে আশ্চর্য্য হ'বে যে একটিন্ জামের জন্য মেয়েগুলোর কাছ থেকে ওরা কত আদায় ক'রেছিল। শুন্‌বে তবে? দশ ফ্রাঁ। একে দিনে ডাকাতি ছাড়া আর কি বলি? গার্ট্রুড্ আমায় ব'লে কি জানো? এইটুকু একরত্তি একটা ছোট টিন্, হাফ্ ক্রাউনের চেয়ে বোধ হয় দেখ্‌তে বড় নয়। আর তার কিনা মুখে এক চামচ তুল্‌তে না তুল্‌তেই দাম হেঁকে বস্‌ল দশ ফ্রাঁ! নচ্ছার পাজীরা সব! ওদের জব্দ করবার জন্য গার্ট্রুড্ সঙ্গে করে টিন্‌টা বাড়ী নিয়ে এসেছিল। ঠিক্ করেছে সে। নয় কি, তুমিই বলোনা? এ তো আমাদের মনের উপর ব্যবসাদারী। বিদেশে আমরা গেছি আত্মীয় স্বজনদের শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকু দেখ্‌তে। তাই ওরা ঠাউরে নিয়েছে, যা' চাইবে তাই আমাদের দিতে হ'বে। এইটে হোল সত্যি কথা।" সজোর মন্তব্য ক'রে বৃদ্ধ উড্‌ফিল্‌ড এইবার যাবার জন্য উঠে দরজার দিকে পা বাড়ালে। কর্ত্তা অন্যমনস্কভাবে বলে উঠ্‌লেন "ঠিক্ বলেছ।" কিন্তু কি যে ঠিক্, সে বিষয়ে তাঁর ধারণা অস্পষ্ট র'য়ে গেল। তারপর ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে বন্ধুর পিছু পিছু দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে তা'কে বিদায় দিলেন।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখে তাঁর শূন্য ও উদাস দৃষ্টি। এদিকে, কুকুর যেমন প্রভুর সঙ্গে বেড়াতে যাবার আশায় অধীরভাবে ছট্‌ফট্ করে, অফিসের দাসী তেমনি করেই তাঁরই প্রতীক্ষায় একবার ক'রে ঘরের ভিতর আস্‌ছিল, আবার ফিরে যাচ্ছিল। মনিব সচেতন হয়ে বল্‌লেন, "মেসী! আরো আধ ঘণ্টাটাক্ আমি আছি। ইতিমধ্যে কেউ যদি আসে, বোলো দেখা হবে না। কারুর সঙ্গেই নয়, বুঝ্‌লে?"

"যে আজ্ঞে।"

দরজা বন্ধ ক'রে কর্ত্তা গালচের উপর দিয়ে গম্ভীর, সশব্দ পদক্ষেপে ফিরে এলেন। তারপর স্বীয় স্থূলকায় দেহটী স্প্রিং চেয়ারে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে টেবিলের উপর ঝুঁকে সহসা দুহাত দিয়ে মুখ ঢাক্‌লেন। তাঁর মনে কাঁদ্‌বার বাসনা প্রবলভাবে জেগে উঠ্‌ল। সব দিকে সুবন্দোবস্ত ক'রে এইবার তিনি রীতিমত ভদ্রোচিত শোক প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হলেন।

যখন বৃদ্ধ উড্‌ফিল্ড হঠাৎ তাঁর ছেলের সমাধির কথা উল্লেখ ক'রে বস্‌ল, তখন তাঁর মনে গুরুতর আঘাত লেগেছিল। আর সে ব্যথা এমনি আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত, যে মনে হোল বুঝি বা পৃথিবী সহসা দ্বিধা হ'য়ে গেছে। তাঁর চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল একটী মর্ম্মান্তিক দৃশ্য,—তাঁর ছেলে শুয়ে রয়েছে কবরের মধ্যে আর উড্‌ফিল্ডের মেয়েরা তার দিকে চেয়ে নতনেত্রে দাঁড়িয়ে আছে। কি আশ্চর্য্য! ভাব্‌তেও অদ্ভুত লাগে যে মাঝে দীর্ঘ ছয় বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে, তবুও মৃতপুত্রের যে শেষ স্মৃতি তাঁর মনের মধ্যে জাগরূক রয়েছে সেটা হ'ল—সমর-বেশে সজ্জিত, অক্ষতদেহ, চিরনিদ্রিত একটু যুবকের প্রতিকৃতি। বেদনায় তাঁর হৃদয় মথিত হ'য়ে উঠ্‌ল। অদম্য উচ্ছ্বাসে মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে এল, "বাছা আমার!" কিন্তু এখনও চোখে অশ্রুর আবির্ভাব হয়নি। কই, আগে ত এমন হ'ত না! প্রথম প্রথম ছেলের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে, এমন কি দু এক বছর বাদেও, তার কথা স্মরণ করতে করতেই এমন অসহ্য শোকে তিনি অধীর হ'য়ে উঠ্‌তেন যে খুব খানিকটা অশ্রুবর্ষণ না হ'য়ে গেলে তাঁর হৃদয় কিছুতেই শান্ত হ'ত না। সে সব দিনে তিনি সকলের কাছেই জোর গলায় ব'লে বেড়িয়েছেন যে কালক্ষেপে শোকের গুরুত্ব কিছু লাঘব হয় না। সময়-গুণে অন্য লোকে হয়ত আবার সুস্থ ও সমাহিত হ'তে পারে, কিন্তু তাঁর যে বিয়োগব্যথা, সে চিরস্থায়ী। বাস্তবিক তাই নাকি কখনো সম্ভব? সে যে ছিল তাঁর একমাত্র সন্তান। তার জন্মগ্রহণের পর থেকে তিনি পরম অধ্যবসায়ের সহিত এই সুবৃহৎ ব্যবসাটী গড়ে তুলেছিলেন। আর আজ সেই ছেলেই যখন তাঁকে ছেড়ে চ'লে গেল, তখন এই প্রাণহীন কাজের বোঝা ব'য়ে বেড়াবার কি দরকার? জীবন আজ তাঁর কাছে বিফল, অলীক স্বপ্ন মাত্র। মনে মনে এযাবৎ তিনি এই আশা পোষণ ক'রে এসেছেন যে একদিন সুদূর ভবিষ্যতে পুত্র তাঁর আসনটী অধিকার কর্‌বে এবং তাঁরই পরিত্যক্ত কর্ম্মভার নিজস্কন্ধে সগৌরবে তুলে নেবে। নতুবা, এই যে দিনের পর দিন প্রাণান্ত পরিশ্রম, অর্থকরী ব্যবসায়ের কাছে হীন দাসত্ব স্বীকার আর আত্মাকে সকল প্রকার বিলাসসুখ থেকে বঞ্চিত করা, এসব কেমন ক'রে সম্ভব হোত?

সেই আশা ত আর একটু হ'লেই সফল হ'তে বসেছিল। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ছেলেটী বছর খানেক ধ'রে অফিসে শিক্ষানবিশী কর্‌ছিল। প্রতিদিন একসঙ্গে পিতাপুত্র কাজে বেরোতেন, আবার এক ট্রেণেই ঘরে ফির্‌তেন। অমন ছেলের বাপ ব'লে কত লোকই না স্বেচ্ছায় এসে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে গেছে! সত্যি সে তার নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে কি সুন্দর ও সহজভাবে প্রবেশ ক'রেছিল! অফিসের সমস্ত লোক তা'র নম্র সৌজন্যে মুগ্ধ ছিল। সামান্য কেরাণী থেকে আরম্ভ ক'রে বৃদ্ধ দাসী মেসী অবধি সবাই তার সুখ্যাতিতে মুখর হ'য়ে উঠ্‌ত। কিন্তু এতো আদর ও প্রশংসাতেও সে নষ্ট হয়নি। সকলের সঙ্গে সরল বাক্যালাপ ও অমায়িক ব্যবহার ছিল তা'র প্রধান গুণ। চোখে তা'র সর্ব্বদাই উজ্জ্বল দীপ্তি ও বালকসুলভ চাহনি, আর সব কথাতেই সেই অপূর্ব্ব বলার ভঙ্গী,—"কী অদ্ভুত!"

কিন্তু সে সব আজ অতীত। পুরাণো কথা ভাব্‌লে এখন মনে হয় এসব ঘটনা বুঝি বা কোনো কালেই জীবনে ঘটেনি। সেই দিনের স্মৃতিটা কিন্তু আজো সুস্পষ্ট ও তীব্র, যেদিন মেসী তাঁর হাতে নির্ম্মম বার্ত্তাবহ টেলিগ্রামখানা তুলে দিলে, "আপনাকে জানাইতে অত্যন্ত ব্যথিত বোধ করিতেছি যে………"

অফিস্ থেকে সেদিন যখন বেরিয়ে এলেন, তখন তিনি আর সে মানুষ নন্। এক মুহূর্ত্তে তাঁর জীবনসৌধ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে।

ছ' বছর আগে। ছ'বছর……উঃ! সময় কী ভীষণ শীঘ্র কেটে যায়। মনে হচ্ছে এ ব্যাপার যেন কাল হ'য়েছিল। কর্ত্তা মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিলেন। তাঁর কি বুদ্ধিলোপ হ'ল? মথার ভিতরে কিরকম যেন সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে। মনে বল সঞ্চার ক'রেও তিনি আর প্রকৃতিস্থ হ'তে পার্‌ছেন না। চেয়ার ছেড়ে পায়চারী কর্‌লে কেমন হয়? পুত্রের ছবিখানির দিকে কিছুক্ষণ স্থির ভাবে লক্ষ্য করতে লাগলেন। এখানা কিন্তু তাঁর মনোমত নয়। মুখের ভাবটা ঠিক ওঠেনি, কেমন যেন আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক। এ রকম প্রাণহীন ও কঠিন ছাপ তা'র মুখে ত কোনদিন ছিলনা।

হঠাৎ কর্ত্তার নজর পড়্‌ল তাঁর দোয়াত্‌দানীর দিকে। বড় দোয়াতটীর মধ্যে দেখ্‌লেন একটী মাছি উড়ে পড়েছে। আহা! আলোয় বেরিয়ে

আস্‌বার জন্য তার কি ক্ষীণ অথচ দুরন্ত প্রয়াস! ছোট ছোট পাগুলি যেন বল্‌ছে "আর পারিনা, আমায় সাহার্য্য কর।" কিন্তু দোয়াতের ভিতরটা বড় পিছল ও মসৃণ। মাছিটা উঠ্‌তে চেষ্টা ক'রে আবার প'ড়ে গেল। দোয়াতের ভিতরে কালীর মধ্যে সে সাঁতার কাট্‌তে লাগল। কর্ত্তা একটা কলম দিয়ে ভয়ার্ত্ত জীবটীকে বাইরে তুলে ফেলে তাঁকে একটুক্‌রো ব্লটিং কাগজের উপর ঝেড়ে রাখ্‌লেন। এক মুহূর্ত্তের জন্য মাছিটা চুপ্‌ ক'রে প'ড়ে রইল। গা দিয়ে তার কালী ঝর্‌ছে, খানিকটা ব্লটিং কাগজে শুকিয়ে গেল। তার পর ধীরে ধীরে সাম্‌নের পাগুলি একটু নড়্‌ল। তাই দিয়ে কাগজের উপরটা আঁকড়ে ধ'রে মাছিটা তা'র সিক্ত দেহটী টেনে খাড়া করল্‌। এইবার শরীর সংস্কারের আয়োজন সুরু হ'ল। একটা পা একবার পাখার উপর তুলে দেয়, আবার পরমুহূর্ত্তেই নামিয়ে নেয়। এই ভাবে খানিকক্ষণ গাত্র-মার্জ্জন চল্‌লো। ক্ষণিক বিরতির পর মাছিটী পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে ক্ষুদ্র পাখা দুটী বিস্তার করতে চেষ্টা করলে। সফলতার আনন্দে সে দিশেহারা হ'য়ে পড়্‌ল। কিছুক্ষণ চুপ্‌চাপ্‌। তারপর বিড়ালের মত অখণ্ড মনোযোগের সহিত নিজের কালী-মাখা মুখখানি পরিচ্ছন্ন কর্‌তে বসে গেল। যে রকম হাস্যকর ভঙ্গীতে মাছিটা তার ছোট ছোট পাগুলি নিয়ে ঘসাঘসি করছিলো তা'থেকে কল্পনা করা কঠিন নয় যে কতটা আশাতীত পুনরুজ্জীবনের আনন্দে তা'র মন প্রাণ উচ্ছল! ভীষণ বিপদ্‌ কেটে গিয়েছে। অতি কষ্টে এ যাত্রা বেঁচে গিয়ে সে এখন অনাবিষ্কৃত ভবিষ্যতের পথে নূতন জয়যাত্রার জন্য প্রস্তুত।

কিন্তু ঠিক্‌ সেই মুহূর্ত্তে কর্ত্তার মগজে সহসা নব প্রেরণার উদ্বোধন হ'ল। কলমটা তিনি কালির মধ্যে ডুবিয়ে নিলেন। পরে নিজের সুপুষ্ট কব্জিখানা অতি সন্তর্পণে ব্লটিং কাগজের উপর রাখ্‌লেন। মাছিটা এইবার যেই পাখা মেলে উড়্‌তে যাবে, অমনি উপর থেকে নাম্‌ল মসীর বিন্দুপাত। এ আবার কি? কিছুই ঠাহর হয় না যে! অনাগত নব বিপদের সূচনায় ক্ষুদ্র প্রাণীটা বিস্ময়ে স্তব্ধ ও ভয়ে মুহ্যমান হ'য়ে পড়্‌ল। পাছে আবার কিছু সাংঘাতিক ঘটে, এই ভেবে সে আড়ষ্ট হ'য়ে বসে রইল। আর নড়্‌বার নাম নেই। তারপর সাহসে ভর ক'রে অতি কষ্টে টল্‌তে টল্‌তে

অগ্রসর হোল। প্রথমে সাম্‌নের পাগুলি ঈষৎ কম্পমান; তারপর প্রতিটী পদক্ষেপ স্থির এবং সুনিশ্চিত হ'য়ে এল। যাত্রা আবার গোড়া থেকে সুরু হোল।

কর্ত্তা ভাব্‌লেন, "কী ধৈর্য্যশীল ও সহিষ্ণু জীব!" বাস্তবিক এই নগণ্য প্রাণীটার সাহস ও স্থৈর্য্য দেখে তাঁর মনে অবিমিশ্র শ্রদ্ধার উদ্রেক হোল। এই ত হোল কঠিন বাধা-বিপত্তিকে আয়ত্ত কর্‌বার প্রকৃষ্ট মনোভাব। সমস্যাবহুল জীবনকে এই ভাবেই ত বরণ করা উচিত; কখনও হাল ছাড়্‌তে নেই। প্রশ্নটা তা হ'লে দাঁড়াচ্ছে এই...। কিন্তু ততক্ষণে মাছিটা তা'র দুরূহ কার্য্য সমাধা করেছে। কর্ত্তা তাড়াতাড়ি কলমটা ডুবিয়ে কালিতে ভ'রে নিলেন। তারপর তা'র নূতন পরিষ্কার করা গায়ের উপর আর একটী বড় ফোঁটা লক্ষ্য ক'রে ঝেড়ে দিলেন। এইবার কোথায় যাবে বাছা?

প্রতীক্ষাকুল নীরবতায় মুহূর্ত্তগুলি দীর্ঘ হ'য়ে উঠ্‌ল। আরে, মাছিটা যে আবার সাম্‌নের শুঁড়গুলো নাড়ছে! কর্ত্তার মন থেকে দুশ্চিন্তার ভার অপসৃত হ'ল। মাছিটার উপর ঝুঁকে প'ড়ে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বল্‌লেন, "সাবাস্‌, ক্ষুদে সয়তান!" একবার খেয়াল হোল, যে আস্তে আস্তে ওর গায়ের উপর ফুঁ দিয়ে আত্মরক্ষায় সাহায্য করলে বেশ হয়। কিন্তু তা' কর্‌বার দরকার হোলনা। কর্ত্তা লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌লেন যে এবার তা'র প্রচেষ্টা বড় ভীরু ও ক্ষীণ হ'য়ে আস্‌ছে, যেন আর পার্‌ছেনা। ঠিক্‌ কর্‌লেন, আর একবার, এবং সেটাই হবে চরম পরীক্ষা।

শেষই বটে! যেমনি ভিজে ব্লটিং কাগজের উপর আর একটী কালীর ফোঁটা পড়্‌ল, মাছিটা অমনি হাত পা গুটিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। নড়বার শক্তি তা'র ফুরিয়েছে। পেছনের পাগুলি গায়ের সঙ্গে লেপ্‌টে গিয়েছে; সাম্‌নের দুটীও অদৃশ্যপ্রায়! কর্ত্তা উত্তেজিত স্বরে বল্‌লেন, "উঠে পড়্‌ চট্‌পট্‌।" বৃথাই উৎসাহবাক্য। প্রাণস্পন্দ তা'র জন্মের মত থেমে গিয়েছে। নিবের ডগাটা দিয়ে তাঁকে একটু নেড়ে দিলেন; নড়্‌লনা।

কাগজ-কাটা ছুরীর সাহায্যে মৃতদেহটা তুলে নিয়ে কর্ত্তা বাজে কাগজের ঝুড়িতে সেটাকে সযত্নে নিক্ষেপ কর্‌লেন।

তারপর কর্ম্মশেষের বিরাট্ শূন্যতা। মনের ভিতর থেকে একটা বিশ্রী ভাব জেগে উঠ্‌ল। ক্রমশঃ সেই অস্বস্তিবোধ এত বাড়্‌তে লাগল যে কর্ত্তা সত্যিই ভীত হ'য়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ঘন্টাটা টিপে ধরলেন মেসীকে ডাক্‌বার জন্য। মেসী এলে তাকে কতকটা রুক্ষ-স্বরেই আদেশ কর্‌লেন, "নতুন এক শিট্ ব্লটিং কাগজ এনে রাখো, শীগগির।"

দাসী চ'লে গেল। কর্ত্তা তখন ভাব্‌তে লাগলেন, এর আগে তিনি কি বিষয় নিয়ে চিন্তা কর্‌ছিলেন। উঃ, ঘামে সারা গাটা ভিজে গেছে। রুমালটা কলারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। তাইত! এতক্ষণ আত্মস্থ হয়ে...

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কথাটা কিছুতেই মনে পড়ল্‌না......

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কবিতা-গুচ্ছ

শোক ও সান্ত্বনা

মুখখানি শুকায়েছে তার
নিদারুণ শোকে
ভাই তার নাই মরলোক।
অধরে করুণ হাসিধার
অসিধার সম
নীরবে চিরিছে হিয়া মম।
গৃহ-কাজে জোড়া দুই হাত
রাঁধিছে বাড়িছে
না জানিয়া এ হিয়া ফাড়িছে।
কিছু যেন ঘটেনি তফাৎ
পৃথিবীতে হায়
সে আমারে বুঝাইতে চায়।

মন তার দূরে দূরে দূরে
উড়িতে উড়িতে
নাড়া দেয় কাঁকণে চুড়িতে।
স্মৃতি তার লুকাইয়া ঘুরে
খেলাঘর খুঁজি
আঁচল খসিছে তাই বুঝি?
আঁখি হতে নামে না প্রপাত
ক্ষীণ বাষ্প-রেখা
সিক্তপ্রায় আঁখিপাতে লেখা।
কিছু যেন ঘটেনি তফাৎ
পৃথিবীতে হায়
সে আমারে বুঝাইতে চায়।

আমি তারে পারিব বলিতে
হেন বাণী কই ?
কখনো বা মৌন হয়ে রই।
কখনো বা ভুলায়ে তুলিতে
পাড়ি অন্য কথা
যদি হয় শোকের অন্যথা।
বিতর্কের করি সূত্রপাত
রাজনীতি তুলি
সংবাদ পত্রিকাখানা খুলি।
কিছু যেন ঘটেনি তফাৎ
এই পৃথিবীতে
আমি তারে চাই বুঝাইতে।

বুঝে লয় চকিতে সে ছল
মহা তর্ক করে
চতুর্গুণ উৎসাহের ভরে।
দুহাতে সরায় বিশৃঙ্খল
কেশ বা কেশর
তর্ককালে প্রতিবন্ধ ওর।
পাছে কারো লাগিবে আঘাত
কেহ নাহি বলে
যে কথা শ্বসিছে হৃদিতলে।
কিছু যেন ঘটেনি তফাৎ
পৃথিবীতে হায়
দুঁহু দোঁহে বুঝাইতে চায় ॥

লীলাময় রায়

শার্দ্দূলের ব্যথা

জরাতুর নখহীন দন্তহীন কামনা আমার
হৃদয়-গুহার তলে অশ্রু-আঁখি করে হাহাকার।
সম্মুখের বনপথে শঙ্কাশূন্য মন্থর-চরণ
সুন্দরী যৌবনময়ী হরিণীরা করে বিচরণ
অহরহ ; চারুগ্রীবা লীলাভরে বাঁকায়ে বাঁকায়ে
ঘৃণাগূঢ় বিদ্রূপের মৃত্যুনীল গরল মাখায়ে
অপাঙ্গ-কুটিল কালো বিচঞ্চল নয়নের শর
মোর বক্ষ লক্ষ্য করি ওরা আজ হানে নিরন্তর!

ওদের নধরদেহ পরিপূর্ণ পেশল কোমল,
ওদের চিক্কণ কান্ত রোমাবলী বিচিত্র উজ্জ্বল,
ওদের চপল পায়ে মধুচ্ছন্দ চটুল নর্ত্তন,
ওদের অলস অঙ্গে বলয়িত মৃদু আবর্ত্তন,
ওদের আবেশে আধো-নিমীলিত আয়ত নয়ন,
ওদের ত্বকের গন্ধ···একদিন মোর দেহমন—
যেদিন জীবন মম যৌবনের ছিল নাট্যশালা,
সংক্ষুব্ধ রক্তের ধারা বক্ষে বহি আগুনের জ্বালা
ছুটিত উত্তালবেগে, সেইদিন—এই দেহমন
পলকে উন্মত্ত করি জাগাইত রোম-হরষণ।
বিবশ বিহ্বল আমি উদ্বেলিত ক্ষুধায় নিষ্ঠুর
অমনি ওদের বুকে ঝাঁপাইয়া করিতাম চুর
যৌবনের সর্ব্ব গর্ব্ব।···

বুভুক্ষার ক্ষণিক বিরাম—
মধুর আলস্যভরে গুহাতলে আঁখি মুদিতাম।
আবার বাহিরে আসি ধীরে ধীরে নিঃশব্দ চরণে
দেহ ঢাকি বনানীর ঘনশ্যামে গূঢ় আবরণে

প্রতীক্ষায় রহিতাম কোনো এক নির্ঝর-কিনারে,
কিম্বা কোনো ছায়াচ্ছন্ন ম্লান-পদ্ম পল্বলের ধারে।
ওপাশে পল্লবতৃণ অকস্মাৎ উঠিত দুলিয়া ;
ক্ষণপরে শঙ্কায়ত সচকিত নয়ন তুলিয়া
হরিণী দাঁড়া'তো আসি সাবধানে—সর্ব্বদেহ মম
শিহরি উঠিত কাঁপি ভূমিকম্পে বসুন্ধরাসম।
নিমেষে ফেনিল লাভা উল্লাসে করিয়া উদ্গীরণ
ঝিমা'য়ে আসিত মোর তৃপ্তি-ক্লান্ত বহ্নিগিরি মন।

সেই-ওরা আজি মোর সম্মুখে নির্ভয়ে চ'লে যায়,
আমি শুধু চেয়ে থাকি শক্তিহীন মূঢ় বুভুক্ষায়।

আজো আমি বেঁচে আছি ! কেন আছি ? একি অভিশাপ !
তরুণ মনেরে ঘিরে মুমূর্ষু জীবন—মহাপাপ।
এ পাপ আমার নয় ; হে ঈশ্বর, তুমি অপরাধী—
তুমিই রচনা করো (কেন করো ?) দেহের সমাধি
না ফুরাতে লালায়িত হৃদয়ের লোলুপ যৌবন !
জরাতুর ইন্দ্রিয়ের কারাগারে অসহায় মন
অবিরাম কাঁদে যতো স্বর্গে ততো হাসে ভগবান্
লীলার আনন্দে—হায়, ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ !

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

সনেট

(রুপার্ট ব্রুকের অনুসরণে)

আলোক-চুম্বিত তনু, বায়ু ক্ষিপ্র-গতি,
লভিনু শয়ন মোরা তৃণশয্যাপরে,

তুমি প্রিয়া বলেছিলে ম্লান খিন্ন স্বরে
"আলো, বায়ু, বিহগকাকলী, বসুমতী
মায়া-ঘেরা রবে অচঞ্চল, যবে জরা
করিবে হরণ নয়নের রূপ-শিখা।"
"রহিবে অম্লান সদা জীবন-বর্ত্তিকা
প্রেমিকের ওষ্ঠাধরে ; লভিয়াছি মোরা
শ্রেষ্ঠ স্বর্গ হেথা, হে মোর অন্তরতম।
মোরা গাহি জীবনের গান সুনির্ভরে ;
মোরা সত্যব্রতী, ধরিত্রীতে শ্রেষ্ঠতম।
বরণ করিব মোরা অকুণ্ঠ অন্তরে
মৃত্যুর অসূর্য্য অন্ধকার"—এত বলি
উল্লসি উঠিনু যবে—তুমি গেলে চলি।

শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল

সনেট

(উইলফ্রিড গিবসন হইতে)

সহসা পল্লবঘন ছায়া-লোক ছাড়ি
উত্তরিনু মোরা স্বপ্নলোকে ; বীতছায়া
শুভ্র চন্দ্রালোক হেথা রচিয়াছে মায়া ঃ
নিস্পন্দ, বিষণ্ণ, মৌন, একখানি বাড়ী
চন্দ্রিকা-প্লাবনে মগ্ন ! বিমূঢ় বিস্ময়ে
রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়াইনু তোরণের পাশে,
সুচির বৎসর যেথা ভুঞ্জিবার আশে
এসেছিনু, তারই পানে চাহিনু সভয়ে !
এ কোন অজ্ঞাত লোক, ধরা হতে দূরে ?
নয়ত এ প্রেত-পুরী ? বিস্ময়-উচ্ছল

নিবিড় রহস্যলোকে আলোক-বন্যায়
মোহাচ্ছন্ন রহিনু দাঁড়ায়ে ভীতিভরে—
মনে হ'ল কত ছায়া-প্রেমিকযুগল
গভীর নিদ্রায় মগ্ন মোদেরই শয্যায়।

শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল

বুভুক্ষা

(এরিসাঁ কেনেল্ রচিত Hunger Infinite অবলম্বনে)

মানুষের ক্ষুধা
একান্ত বন্ধনহীন, অসংযত তুরঙ্গম সম
অসহায় অন্ধ গতি, লজ্জাহীন নৃশংস নির্ম্মম,
পিষিয়া শোষিয়া চায় নিঃশেষিতে রূপের বসুধা !
আকাশের নীল
ম্লান করি উঠে তার বিষাক্ত ফুৎকার—
নীরন্ধ্র খনির গর্ভে গুমরায় তার হাহাকার ;
ধূমায়িত আরক্ত সর্পিল,
সংখ্যাতীত লোল জিহ্বা মেঘে মেঘে করি প্রসারণ
ছুটিছে সে দিকে দিকে, নাহি জানে নিজ গতি-সীমা,
অপার চলার গর্ব্বে বাড়ে তার উলঙ্গ গরিমা,
ছন্দোহীন উন্মত্ত গর্জ্জন !

প'ড়ে আছে প্রাণহীন পথ—
আদিম সৃষ্টির বুকে অতিকায় সরিসৃপবৎ
পিচ্-ক্লিষ্ট ক্লেদাক্ত নিশ্চল—
বিকট ঘর্ঘর স্বনে ছুটিয়াছে বুভুক্ষার রথ,
অগ্নিময় শতচক্রে বিচ্ছুরিয়া উত্তপ্ত গরল !

বিক্ষত বিকৃত-গাত্র বসুন্ধরা খালি পাশ ফিরে
বহ্নিমান্ বিষ-বাষ্প সঞ্চারিছে দীর্ণ বক্ষ চিরে,
মৃতপ্রায় মাটির জঠরে—
তবু চলে জয়রথ অহোরাত্র দুরন্ত ঘর্ঘরে !

শুধু ক্ষুধা, মানুষের ক্ষুধা—
তীব্র, তীক্ষ্ণ, তিলে তিলে গিলিছে বসুধা !
স্বপ্ন নাই, শান্তি নাই, নাই তৃপ্তি-প্রাপ্তির উল্লাস ;
রুদ্ধ অপূর্ণতা ভারে হাহাকারে লুটায় বাতাস
ভিত্তির প্রকোষ্ঠ-গাত্রে, ইষ্টকে, প্রস্তরে—
লৌহ-উদ্বন্ধন-পিষ্ট শ্লথ-স্রোত সরিতে-সাগরে !

নগরীর লক্ষ দীপাধার
ধিমায়ে ঝিমায়ে জ্বলে, আনির্ব্বাণ দীপ্র বুভুক্ষার
বীভৎস প্রেতিনী মূর্ত্তি……আপিঙ্গল, পাংশুল, সবুজ,
দিগন্তের কণ্ঠ রুধি অভ্রংলিহ চিমনী ও গম্বুজ
ঘোষিছে উদ্ধত কণ্ঠে, "চাই খাদ্য চাই !"
হাপর ফেলিছে শ্বাস, মাথা কুটি লুটিছে নেহাই
শ্রান্তিহীন হাতুড়ি-প্রহারে।
অগ্নিময় দ্রব লৌহ লেলিহান শত বাহু মেলি,
হুহু ক'রে ছুটে চলে পারদাক্ত ধাতু-বর্ম্ম ঠেলি,
ডাইসের অন্ধ কক্ষে, অন্ধতম মৃত্যু-অভিসারে !

বিশ্বব্যাপী একি যন্ত্রশালা !
সর্ব্বগ্রাসী অগ্নি-কুণ্ডে অহোরাত্র কালানল জ্বালা !
সন্নত ফলক-শীর্ষে লম্বমান ধাতুময় তারে,
আবদ্ধ বিদ্যুৎ- ফণী ফুঁসিয়া-শ্বসিয়া বারে বারে,

অভিমানে আছ্‌ড়ায় ফণা ;
প্রচণ্ড তাণ্ডবে তার শিহরায় ত্রস্ত দিগঙ্গনা !
টলে পৃথ্বী, টলে অভ্র, অন্তর্দাহে জাগে ভূকম্পন,
নিরুদ্ধ ক্ষুধার দাপে বেপমান গগন-পবন !

কামান-গর্জ্জনে,
গন্ধকের কটুগন্ধে, পিণ্ডীকৃত বারুদ স্ফুরণে,
দিকে দিকে জাগে আর্ত্তনাদ—
দুঃসহ সে ধ্বংস-যজ্ঞে কি প্রচ্ছন্ন ক্ষুধার সংবাদ !
অর্থ-গৃধ্নু বাণিজ্যের ক্ষুধা,
অসতর্ক মৃত্যু সম বাহু-বন্ধে বাঁধিয়া বসুধা,
আপন আবর্ত্ত মাঝে আপনারে ফিরায়ে ঘুরায়ে,
সহস্র ধ্বংসের বীজ জলে-স্থলে ফেলিছে ছড়ায়ে !
ছিন্নশির, ছিন্নবাহু, নাসারন্ধ্রে মস্তিষ্কক্ষরণ,
গতপ্রাণ লক্ষ নর ভূমিতলে পড়িছে লুটায়ে ;
ক্লান্তিহীন শত যান শবদেহ করিছে বহন,
কবরে, চিকিৎসালয়ে, অনিবার্য্য মরণের ছায়ে !
নাহি কারো ক্ষোভ—
ভাঙ্গুর সমাধিস্তম্ভে মুমূর্ষুর আছে কোন্ লোভ ?
অপার ক্ষুধার ফাঁদে আপনারে দহিয়া নিঃশেষে,
ক্রূর সভ্যতার ভক্ষ্য লক্ষ প্রাণ ফুরায় নিমেষে !
শত-সৌধ-কিরীটিনী নিঃসঙ্কোচা লো নগ্না নগরী,
ধূলি-ধূম-সমাচ্ছন্ন এ প্রদোষে আজি প্রশ্ন করি—
এখনো মিটেনি ক্ষুধা ? লম্ফনে ঘর্ষণে
শিহরি রোমাঞ্চি উঠে সুবিশাল দেহ-আয়তন,
রাত্রিদিন ক্লান্তিহীন রূঢ় আলিঙ্গনে
নয়নে ফেনায়ে উঠে বিষ-খিন্ন পিঙ্গল মরণ !
তবু এ কুলটা ক্ষুধা অকৃপণ দেহ-পরিধিরে,

উদ্‌ভ্রান্ত পতঙ্গ সম গুঞ্জরিয়া কাঁদে ঘিরে ঘিরে ?
একবার শূন্য হতে আসে নাকি স্বচ্ছন্দ বাতাস ?
বস্তুর পাহাড় ভেদি, বন্ধহীন অসহ্য প্রকাশ
ফুটাইয়া তুলে নাকি অভিনব একটি প্রভাত—
স্বর্ণাভ অরুণালোকে পরিপূর্ণ সহজ সুন্দর,
জাগ্রত বিহঙ্গ-গীতে, জলস্থল, গগন-পবন,
অরণ্য প্রান্তর,
পরিতৃপ্ত, সুধাসিক্ত, মুখরিত, অগাধ, অবাধ,
মুক্তির আনন্দ-গানে—
এ করাল রাত্রি-অবসানে !

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

শাশ্বতী

শ্যামলী বরষা সাঁঝের আঙিনাপরে
এলায়ে দিয়েছে শ্রান্ত শিথিল কায়া,
ছাড়া পেয়ে আজ লুকাচুরি খেলা করে
গগনে গগনে পলাতক আলো ছায়া।
অলখ শরৎ দাঁড়ালো সমীপে এসে,
শুনি সমীরণে তারি মৃদঙ্গধ্বনি ;
প্রতীক্ষণের অচল নিরুদ্দেশে
উতলা হয়েছে অকারণ আগমনী।
কুহেলীকলুষ দীর্ঘ দিনের সীমা
এখুনি হারাবে কৌমুদীজাগরে যে,
বিরহবিজন ধৈর্য্যের ধূসরিমা
রঞ্জিত হবে দলিত শেফালীশেজে।

মিলনোৎসবে সেও তো পড়েনি বাকি,
নবান্নভোজে তাহারো আসন পাতা ;
পাছে চাহে শুধু আমারি উদাস আঁখি,
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা ॥

একদা এমনি বাদলশেষের রাতে—
মনে হয় যেন শত জনমের আগে—
সে আসি সহসা হাত রেখেছিলো হাতে,
চেয়েছিলো মুখে সহজিয়া অনুরাগে।
সেদিনো এমনি ফসলবিলাসী হাওয়া
মেতেছিলো তার চিকুরের পাকা ধানে ;
অনাদি যুগের যত চাওয়া যত পাওয়া
খুঁজেছিলো তার আনত দিঠির মানে ;
একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিলো সাতটি অমরাবতী ;
একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণী জুড়ে,
থামিলো কালের চিরচঞ্চল গতি ;
একটি পণের অমিত প্রগল্‌ভতা
মর্ত্ত্যে আনিলো ধ্রুবতারকারে ধ'রে ;
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্ব্বলতা
প্রলয়ের পথ দিলো অবারিত ক'রে ॥

আজি সে-রজনী ফিরেছে সগৌরবে,
অধরা আবার ডাকে সুধাসঙ্কেতে ;
মদমুকুলিত তারি দেহসৌরভে
অনামা কুসুম আঁধারে উঠেছে মেতে।

আজিকে আকাশ নীল তারি আঁখিসম ;
সে রোমরাজির কোমলতা নব ঘাসে ;
তাহার রসনা পুন বলে—"প্রিয়তম" ;
আজি সে কেবল আরকারে ভালবাসে।
স্মৃতি-পিপীলিকা তাই এ-মাধুরী হ'রে
অমার রন্ধ্রে পুঞ্জিত করে কণা ;
সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিবো না, আমি কভু ভুলিবো না ॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পুস্তক-পরিচয়

প্রিয়া ও পৃথিবী—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।
পৃথিবীর পথে—বুদ্ধদেব বসু।
উর্ব্বশী ও আর্টেমিস্—শ্রীবিষ্ণু দে।
} প্রকাশক :— গ্রন্থকারমণ্ডলী।
কোজাগরী—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত। প্রকাশক—প্রবাসী প্রেস।

অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব ও বিষ্ণু তিনজনই ক্ষমতাশালী নবীন লেখক। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম দুইজন বাংলা সাহিত্যের একাধিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে নবীন ও প্রবীণ বর্ত্তমান সকল লেখকের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গুরু রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ইঁহাদের দুইজনেরই রচনার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। অচিন্ত্যকুমারের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "অমাবস্যা" সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :

> অদ্ভুতের অবতারণার জন্যে কোথাও কিছুমাত্র জবরদস্তি নেই। একটি নিবিড় আবেগ স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যের মধ্য দিয়ে দীপ্তি পাচ্ছে, শ্রাবণের সজল সন্ধ্যা-মেঘের গভীরতার থেকে বিচ্ছুরিত সূর্য্যাস্তরশ্মির মতো।

বুদ্ধদেবের প্রথম কবিতার বই "বন্দীর বন্দনা" সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ ঐ একই কথা প্রায় একই ভাষায় বলিয়াছেন :

> এই রচনাগুলি জলভরা ঘন মেঘের মতো, যার ভিতর থেকে সূর্য্যের আলোর রক্তরশ্মি বিচ্ছুরিত। ভয় ছিল পাছে সৃষ্টিছাড়া নূতনত্বের গলদ্‌ঘর্ম্ম প্রয়াস দেখা যায়।

অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেবের নব প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়ের সমালোচনাসূত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের পূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিবার কারণ কি পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কারণ এই যে এই দুইখানি বইয়েরই আচ্ছাদন-পত্রে রবীন্দ্রনাথের সার্টিফিকেট সযত্নে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাই স্বভাবতই তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং (পাঠক আমার মনের দুর্ব্বলতা মার্জ্জনা করিবেন) সহজেই মনকে তাহা প্রভাবান্বিত করে—অবশ্য আমি শুধু আমার মনের কথা বলিতেছি। তাই অত্যন্ত আশার সঙ্গে "প্রিয়া ও পৃথিবী" এবং "পৃথিবীর পথে" বই দুইখানি পড়িতে আরম্ভ করি এবং গভীর অধ্যবসায়সহকারে আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করি। বই দুইখানি আকারে ক্ষুদ্র, পড়িতে সময় বেশি লাগে না। তবু অধ্যবসায়ের প্রয়োজন ছিল, কেননা মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে প্রথমবার পড়িয়া এমন একটি কবিতা এই দুইখানি বইয়ের ভিতর খুঁজিয়া পাই নাই, অথচ রবীন্দ্রনাথ যাঁহাদের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন তাঁহাদের রচনা একেবারে সাধারণ বলিয়া ফেলিয়া দিতেও সাহস হয় না (পাঠক আমার ভীরুতা আবার মার্জ্জনা করিবেন)। তাই বার বার বই দুইখানি পড়ি—এই আশায় যে অনেক বড় লেখকেরই রচনার সৌন্দর্য্য প্রথমে ধরা পড়ে না, বারম্বার চেষ্টার পর পড়ে, ইঁহাদের সম্বন্ধেও হয় ত তাহাই হইবে। দুঃখের বিষয় তাহা হয় নাই, তাই প্রত্যাশিত আনন্দের অভাবে সচেষ্ট অধ্যবসায়ের নিতান্তই প্রয়োজন ছিল।

তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন ইঁহাদের কবিতা আমার খারাপ লাগিয়াছে। এমন সুলিখিত কবিতা বাংলা ভাষায় সচরাচর পড়া যায় না। ভাষা ও ছন্দের উপর ইঁহাদের (বিশেষ করিয়া অচিন্ত্যকুমারের) দখল প্রশংসনীয়। এই দুইটি বইয়ের মধ্যে বোধ হয় এমন একটিও কবিতা নাই যাহা অশ্রাব্য বা অপাঠ্য। কিন্তু এমন কবিতাও একটি নাই যাহা বারবার পড়িতে ইচ্ছা করে, ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ে মনের উপর যাহার প্রভাব গভীরতর হয়।

ভাষার ও ছন্দের নৈপুণ্য সত্ত্বেও এইরূপ হইবার কারণ কি? প্রকৃত কবিত্ব শক্তির অভাব? ঠিক তাহা মনে হয় না। বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যকুমার যে প্রকৃত কবি তাহাতে আমার অন্তত সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কথা মনে হয় যে তাঁহারা এখনো নিজেদের ভাষা খুঁজিয়া পান নাই। উচ্চশ্রেণীর রচনামাত্রেরই যাহা প্রধান লক্ষণ—ষ্টাইল—বুদ্ধদেবের ও অচিন্ত্যকুমারের রচনায় তাহার আভাসমাত্র নাই। ভাষার ও ভঙ্গীর যে নৈপুণ্য ইঁহারা আয়ত্ত করিয়াছেন তাহা ইঁহাদের স্বকীয় নহে, রবীন্দ্রনাথের বিপুল ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত। তাই নবীন লেখক হইলেও ইঁহাদের ভাষার আশ্চর্য্য পরিণতি দেখা যায়, অন্তত অচিন্ত্যকুমারের রচনায়, বুদ্ধদেবের তুলনায় তাঁহার হাত অনেক পাকা। তবে মনে রাখিতে হইবে বুদ্ধদেবের "পৃথিবীর পথে"র কবিতাগুলি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে—১৯২৬-২৮ সালে—রচিত।

প্রশ্ন উঠিতে পারে রবীন্দ্রনাথের ভাষা কি তাঁহার মৌরসী পাট্টা, অন্য কোনো লেখক কি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না? প্রতি দেশেই বড় বড় লেখকের রচনার মধ্য দিয়া ভাষার ক্রমোন্নতি হয়। রামমোহনের সময় হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা একটির পর একটি প্রতিভাশালী লেখকের হাতে নব নব শক্তি ও সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে। এই শক্তি ও সম্পদ তো কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল লেখকেরই তাহাতে সমান অধিকার আছে। অবশ্য। কিন্তু রচনাভঙ্গী বা ষ্টাইল সম্বন্ধে ঠিক এই কথা বলা চলে না—তাহা প্রতিভাবান লেখকমাত্রকেই স্বকীয় শক্তিতে অর্জ্জন করিতে হয়। কোনও লেখক যতই প্রতিভাশালী হোন্ না কেন, তাঁহার প্রথম বয়সের রচনার এই ষ্টাইল থাকে অসম্পূর্ণ এবং অপরিণত, কিন্তু তবু তাহা সম্পূর্ণ স্বকীয়। রবীন্দ্রনাথের "সন্ধ্যা সঙ্গীত" পুস্তকে এই উক্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখিয়াছেন সন্ধ্যা সঙ্গীতে তিনি প্রথম নিজের সুর আবিষ্কার করেন। কাব্য হিসাবে এই বইখানি হয়তো উচ্চশ্রেণীর নহে—ইহার ভাষা ও ভঙ্গী অসংহত, অপরিণত, কিন্তু তবু ইহার ষ্টাইল কবির নিজস্ব, অন্য কাহারও নহে, ইহাতে কবি যাহা বলিতে চাহেন তাহা খুব মনোগ্রাহী ভাবে না হইলেও নিজের মতন করিয়া বলিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে রচিত "ভানুসিংহের পদাবলী"র ভাষা ও ভঙ্গী ইহার তুলনায় অনেক নিপুণ, কিন্তু তাহা কবির নিজস্ব নহে, যদিও "ভানুসিংহের পদাবলী"র মধ্যে প্রকৃত কাব্যের পরিচয় একাধিক স্থানে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে, তবু "পৃথিবীর পথে" এবং "প্রিয়া ও পৃথিবী"র পরিণত ভাষা ও রচনাভঙ্গী তরুণ লেখকদ্বয় কি ভাবে সংগ্রহ করিলেন তাহার আলোচনা করিতে যাইয়া এত কথা আসিয়া পড়িল, তাহার কারণ, আমাদের সৌভাগ্য হউক বা দুর্ভাগ্য হউক, বাংলা সাহিত্যের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব

এত ব্যাপক যে তাঁহাকে বাদ দিয়া বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের আলোচনা চলেনা। বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যকুমার যে-লেখকমণ্ডলীর নেতৃস্থানীয় তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করিয়া বাংলা সাহিত্যকে নবতর উন্মেষের পথে লইয়া গিয়াছেন এই দাবী তাঁহাদের নিজেদের মুখেই শোনা যায়। অনেক সময়ে জোর করিয়া উৎকট এবং অস্বাভাবিক রচনাভঙ্গী বা বিষয়বস্তুর সাহায্যে তাঁহারা নিজেদের নবীনত্ব ঘোষণা করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। যাহাই হউক, বুদ্ধদেবের ও অচিন্ত্যের পূর্ব্বপ্রকাশিত দুইটি কাব্যগ্রন্থে অন্তত তাঁহাদের রচনা যে এই জাতীয় 'সৃষ্টিছাড়া নূতনত্ব'কে অবলম্বন করিয়া উৎকর্ষ অর্জ্জন করে নাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রশংসায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান দুইটি কাব্যগ্রন্থসম্বন্ধেও ঠিক তাহাই বলা চলে। ইহাদের রচনাভঙ্গীতে যদি কোথাও সামান্যমাত্র উৎকটতা থাকিত তাহা হইলে হয়তো ইহারা এতটা বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত হইতনা। তবে বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও ইহাদের উৎকর্ষ আছে, কিন্তু সে উৎকর্ষ প্রকাশ পাইয়াছে সৃজনী প্রতিভার দুর্নিবার আবেগের ভিতর দিয়া নহে, পরস্ব আভরণের প্রতিফলিত দীপ্তিতে। তাই মনে হয় এই দুইটি লেখকের মধ্যে যে-প্রকৃত কবিত্বশক্তি আছে এই আভরণভারে তাহা আজ চাপা পড়িয়াছে। যদি তাঁহাদের কাব্যপ্রতিভার অন্তর্নিহিত শক্তি নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী না হয় তাহা হইলে একদিন হয়তো স্বকীয় আলোকে তাহা দীপ্যমান হইবে, কিন্তু আলোচ্য পুস্তকদ্বয়ে তাহার পরিচয় অতি সামান্যই পাওয়া যায়।

আরো একটু কথা বলিবার আছে। তাহা এই যে শুধু রবীন্দ্রনাথের প্রভাবই যে ইঁহাদের উপর পড়িয়াছে তাহা নহে। বাংলাদেশের আরো দুই একটি কবির প্রভাব ইঁহাদের রচনায় স্থানে স্থানে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বুদ্ধদেবের 'বিরহীর চিঠি' কবিতাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সজল হাওয়া হিম-আঙ্গুলে
দিকনা তোমার খোপা খুলে ;
কুন্দ কলি পড়ুক খসে'
ছড়াক বায়ে পরাগ-মুঠি।
বৃষ্টি তোমায় আদর করুক
পায়ের নখের আলতা খুঁটি।

এই কয়টি লাইন সত্যেন্দ্রনাথ লিখিতে পারিতেন। অবশ্য ইহার পরবর্ত্তী কয়টি লাইনের ভাষা সত্যেন্দ্রনাথের নিকট ধার-করা হইলেও ভাব বুদ্ধদেবের নিজস্ব :

আঁচল ঈষৎ আলগা হ'লেও, নাই বা তা'রে বাঁধলে আবার,
গোপন তব গন্ধ সুধা, আজ ধরারে দাও কিছু ধার।

অচিন্ত্যকুমারের একটি কবিতা "লীলাবধূ ও আত্মা-বধূর"—কয়েকটি পংক্তি :

চটুলোল চারুনেত্র, কি বিচিত্র ভ্রূলতাবিভ্রম !
মঞ্জুল যৌবনকুঞ্জে উগ্রগন্ধ ফুটেছে বকুল ;
বিকচ রুচির গণ্ড স্ফুটোন্মুখ, কবি মনোরম,
সুখ-পূর্ণিমার পার্শ্বে অমাবস্যা কালো এলোচুল !

অত্যন্ত সুলিখিত, সমস্ত কবিতাটি সম্বন্ধেই এই কথা বলা চলে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রভাব কি ইহাতে সুস্পষ্ট নহে ?

অচিন্ত্যকুমারের 'প্রিয়া ও পৃথিবী' বইটির নামকরণ হইয়াছে যে-কবিতাটির নামে সেই কবিতা হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করা গেল :—

আজি তুমি পলাতকা, মুক্তপক্ষ পাখী উদাসীন,
ক্লান্ত, দূরনভচারী দিগন্তের সীমান্তে বিলীন।
বিদ্যুৎ ফুরায়ে গেছে, কখন বিদায় নিল মেঘ,
অবিচল শূন্যতার নভোব্যাপী নিস্তব্ধ উদ্বেগ
আবরিয়া রহিয়াছে হৃদয়ের অনন্ত পরিধি,
চাহিনা ঘৃণিত মৃত্যু, তব গুপ্ত হীন প্রতিনিধি।

এই পংক্তি কয়েকটিতে কাহার প্রভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বলার প্রয়োজন নাই, কিন্তু পরের প্রভাব লেখককে যে সহজে আপন করিয়া লইতে পারেন তাহার সুন্দর পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। এই কবিতাটির মধ্যে যে-উৎকর্ষ দেখা যায় বুদ্ধদেবের বইতে তাহা কোথাও নাই, অচিন্ত্যকুমারের বইতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায় বোধ হয় মাত্র এই একটি কবিতাতে।

'উর্ব্বশী ও আর্টেমিস্' প্রণেতা শ্রীবিষ্ণু দে বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যকুমারের দলভুক্ত এবং তাঁহাদের বয়ঃকনিষ্ঠ এবং বোধহয় তাই তাঁহাদের অপেক্ষাও নবীনতার দাবী বেশি রাখেন—অন্তত তাঁহার কবিতা পড়িয়া সেই ধারণা হয়। অচিন্ত্যকুমারের রচনায় যে-মাধুর্য্য ও নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় বিষ্ণুবাবুর রচনায় তাহা বিরল। মাঝে মাঝে তাঁহার ভাষা ঠিক উগ্র না হইলেও একটু অদ্ভুত লাগে এবং অনেকস্থলেই তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়না। এই দুর্ব্বোধ্যতা বোধ হয় লেখকের অভিপ্রেত। শ্রীবিষ্ণুদে শুধু তাঁহার বইয়ের নাম-করণে বিদেশী শব্দ অবতারণ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, বইটির ভিতরকার অনেক কবিতাতেও তাহা করিয়াছেন। "ড্যানায়" "ওরাওন", "ডিয়োটিমা," "স্থসি" "ম্যামথ" "নেয়াড" "নেপচুন", "ট্রিষ্টান," "ইসোল্ড্" এমনকি "নোজগে"—"চিরজীবী নোজাগ আমার"—প্রভৃতি নানা বিজাতীয় চেতন ও অচেতন নায়ক-নায়িকা এই ক্ষুদ্র বইটির অল্প-সংখ্যক পাতায় ভিড় করিয়া ভাষাতত্ত্বের এবং পুরাতত্ত্বের এক জটিল সংমিশ্রণ সৃষ্টি করিয়াছে। আরো আছে—'ষ্টিলনীল' সাগর এবং 'সিল্‌কমসৃণ' ললাট। এই জাতীয় বিশেষণ লেখকের দৃষ্টিশক্তির এবং স্পর্শশক্তির সূক্ষ্মতার পরিচায়ক। শ্রীবিষ্ণু দে নবীন কবি সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে যে-অদ্ভুতের অবতারণা বুদ্ধদেবের ও অচিন্ত্যকুমারের রচনায় নাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ পরম আশ্বস্তি বোধ করিয়াছেন বিষ্ণুর কবিতায় তাহা মাঝে মাঝে থাকা সত্ত্বেও তাঁহার রচনা-শক্তির উৎকর্ষের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বুদ্ধদেবের ও অচিন্ত্য-কুমারের লেখায় দুষ্প্রাপ্য। অবশ্য রচনা-শক্তি বলিতে শুধু ভাষার নৈপুণ্যের কথা নয়—সমগ্রভাবে কাব্যসৃষ্টির কথা বলিতেছি। এই তিনটি নবীন লেখকের মধ্যে একমাত্র তাঁহারই কবিতায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সব সময়ে সুন্দরভাবে না হউক অনিবার্য্যভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, একমাত্র তাঁহারই রচনায় 'ষ্টাইল'-এর আভাস পাওয়া যায়, তাহা অপরিণত এবং অবশ্যই অসম্পূর্ণ এবং ত্রুটিবহুল, কিন্তু তবু তাহা ষ্টাইল। কিন্তু 'উর্ব্বশী ও আর্টেমিস' পুস্তকের একটি কবিতা—'উর্ব্বশী'—এই সকল ত্রুটিও অসম্পূর্ণতাকে কাটাইয়া উঠিয়াছে মনে হয়। এই পত্রিকায় কবিতাটি ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে তাই তাহার উদ্ধার নিষ্প্রয়োজন। কয়েকমাত্র পংক্তিতে কবিতাটি সম্পূর্ণ। কিন্তু এই কয়েকটি পংক্তির সংহত আবেগে জলস্থলআকাশের বিপুল মায়া আশ্চর্য্যরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং এই

বিরাট পটভূমিকার উপর নরনারীর নিবিড় কামনা অসীম ব্যাপ্তিতে পরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্তের "কোজাগরী"র সহিত আলোচ্য অপর তিনটি পুস্তকের ভাবগত বা ভাষাগত কোনো সাদৃশ্যই নাই। প্যারীমোহনকে এখনও ঠিক প্রবীণ বলা চলে না, কিন্তু অবশ্য তিনি অভিজ্ঞ লেখক। মাসিকপত্রে প্রকাশিত তাঁহার কবিতার সহিত বাঙালী পাঠকের পরিচয় বহুদিনের। বেশ সহজপাঠ্য কবিতা তিনি লেখেন, ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁহার দখল আছে, কোনো 'থিওরী'র বালাই তাঁহার নাই। তাঁহার কবিতার বিষয়বস্তু বিস্তৃত ক্ষেত্র হইতে আহরিত, ইহা তাঁহার মনের প্রসারের পরিচায়ক।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

Collected Poems—Herbert Palmer (Benn).
News from the Mountain—Richard Church
(Dent & Sons)

হারবার্ট পামার Cinder Thursday লিখে ব্যঙ্গরসিক (Satirist) বলে' নাম করেছিলেন। এই বইখানিতেও Cinder Thursdayর কয়েকটি কবিতা আছে, তাছাড়া ১৯৩১ পর্য্যন্ত তাঁর যত কবিতা বেরিয়েছে প্রায় সবগুলিই এতে স্থান পেয়েছে। বইটির পরিষ্কার ছাপা, অনাড়ম্বর প্রচ্ছদপট, সহজেই মনকে আকৃষ্ট করে। তবু মনে একটুখানি আশঙ্কা নিয়ে বইখানা পড়তে আরম্ভ করেছিলাম,—অতি-আধুনিকতার কুয়াসা কাটিয়ে কিছু বুঝতে পারার ভরসা কম বলেই। সময়ের হিসেব দিয়ে বিচার করলে Palmer অতি-আধুনিক দলেই পড়েন। বইখানা প্রকাশিত হয়েছে এই বছরে, যদিও অনেকগুলি কবিতা আগেই নানা জায়গায় প্রকাশিত হয়েছে। ছু'একটা কবিতা পড়বার পরেই মনে হ'ল অনেক দিনের পুরোণো সুর আবার ফিরে' পাচ্ছি। নিতান্ত সহজ সুরে এই আধুনিক কবি নিজের অনুভূতি বলে' গেছেন, কোথাও বাধা পায় নি। প্রকৃতির উদার আবেষ্টনে মানুষের মন চিরদিন মুক্তি পেয়ে এসেছে; মানব-মনের এই চিরন্তন অনুভূতি কবির কথায় রূপ পেয়েছে।

"And yet, when I go walking through the woods,
On frosty days, and watch the falling snow,
I would renounce all culture's radiant moods
To live in ice-lands with the Eskimo."—'Snow'.

'Talking Water-এও এইভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। Nature in War-Timeএ যুদ্ধের বিভীষিকা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য কতখানি নষ্ট করে তার একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রকৃতি মূক, তা' না হ'লে মানুষের এই তাণ্ডবলীলার প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'য়ে উঠত।

"If flowers could speak
And leaves and plants knew words
In what strange phrase of chiding would they seek.
To tell their anger at this clash of swords.

* * * * *

Shrapnel crushes them in its fierce caress ;
The black guns chant a paean of their skill.
But little recks the world in its distress
The sorrow that is silent on the hill."

অনেকগুলি কবিতাই গত মহাযুদ্ধের ছবি দৃষ্টির সামনে এনে দেয়। যুদ্ধের শেষে মানুষের মনে যে বিতৃষ্ণা জেগেছিল কবিতাগুলিতে তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। এতে একদিকে যুদ্ধক্ষেত্রের নিষ্ঠুরতা যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনই যুদ্ধের যে একটা বিরাট সৌন্দর্য্য আছে, তাও মনকে স্পর্শ করে।

"I wonder if they'll come to-night !
The round moon rolls in silvery light,
No sound throbs on the windless air.

* * * * *

For oh, to hear the mad guns go,
And watch the starry night aglow
With radiance of crackling fires
And the white searchlight's quivering spires"—Air Raid"

Air Raid এর মত ঘটনাও সুন্দর কবিতায় রূপান্তরিত হ'তে পারে, আধুনিক অনেক ঘটনা বা দৃশ্যের মত—Palmer তা' দেখিয়েছেন। মনে হয় যুদ্ধের এই দুই বিপরীত দিক কবির মনকে সমভাবেই স্পর্শ করেছে। যুদ্ধের প্রলয়লীলার অন্তরালে যে করুণ কাব্যরচনা চলেছে তাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি ; The Epic of Two Foeman তার দৃষ্টান্ত।

"And the Angel of Death beat lightly
That they heard not his great drum's roll
As into the storm-wracked sunset
Soul was flung forth upon soul ;
For the Highlander sobbed o'er the German.—
He was staring up at the sky.
Clatter ! Whizz ! Boom ! Went the battle.
And the old red drummer passed by.
And eyes met eyes in the dim light ;
And their souls like lashing rain
Smote together, locked, and were blended
In the shimmering whirlpools of Pain."

মানুষের ছোটখাট সুখ, দুঃখ, অনুভূতিও Plmerএর সার্থক লেখনীতে সুন্দর রূপ ধরেছে। এঁর কবিতায় কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য্য যেমন আছে, তেমনই এঁর ভাষার কুহক মনে যে জাল বোনে তা' সহজে ছেঁড়ে না।

News from the Mountains—Richard Church-এর লেখা ছোট কবিতার বই। বইখানির ওপরে কবির Portrait। তাঁর বুদ্ধিমার্জ্জিত মুখের ভাবুকতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কবিতাগুলির মধ্যে একটি ভাবসমন্বয় আছে। বইখানির নামকরণে সেই ভাবধারার আভাস পাওয়া যায়।

"To you who creep below
Upon the ocean-bed of air,
I sound this trumpet-blare
From my island peak of snow."

এই কথাগুলি দিয়ে প্রথম কবিতা—News from the Mountain আরম্ভ হয়েছে। এই কবিতারই শেষে কবি বলেছেন,—

"Here stand I careless of my lovely dead,
Those whom I mourned below.
Cruel as stars,
And passionless as moonlight, I look down
Upon the waves of that mercurial sea
Which lies in lazy grandeur on human earth,
Where all I was, and even might be, sleeps,
Sleeps on beneath the drug of material air.
Now without mercy, I wake to solitude,
Lift up the silver trumpet of my madness
And blow defiance over the huddled world."

এই কবিতাটিকে বইখানির মুখবন্ধ বলে' ধরা যেতে পারে।

Churchকে অনেক সময়ে 'cold and austere' বলা হয়েছে, কিন্তু তাঁর lyric কবিতাগুলি পড়লে তাঁর প্রতি এই দোষারোপ ন্যায়সঙ্গত মনে হয় না। রিচার্ড চার্চ্চকে প্রধানতঃ lyric কবিই বলা চলে। সুন্দর ভাষায় লেখা ছোট কবিতাগুলি সহজ সৌন্দর্য্যে মন ভরে' দেয়। এই বইখানির শেষ কবিতা Silence এর দৃষ্টান্ত।

"Ah ! quiet in the woodland !
The beech-trees are still.
The cloud-shadows wander
Over the hill.
Farewell to the reaper ;
Farewell to the sun.
The tumult is over,
The task is done."

অল্প কথায় ছবি ফুটিয়ে তুলবার ক্ষমতাও তাঁর অসাধারণ। The Cornish Cliffএ কয়েকটি কথায়,—

"Night fell on the open Sea ;
And the ancient harbour folded
Its arms. One, two, and three,
The lamps in cottage windows gleamed
Down the dark water, shook and streamed,
While the last gull scolded."—

যে ছবিটি চোখের সামনে ফুটে ওঠে, তা' তুলি দিয়ে আঁকা ছবির মতই স্পষ্ট ও সুন্দর। Caprice in Trafalgar Squareএ "Yesterday the sun came flirting to the fountains ;" এবং Supertitionএ—"All night the wind moaned Under the rooftree,"র মত lineগুলিও এই রকম ছবি মনে আনে। মানবজীবন, তার গভীর বেদনা, সূক্ষ্ম অনুভূতিও অনেকগুলি lyricএ প্রকাশ পেয়েছে। Crevasse, In the Beginning, The Prison, The Sound Within প্রভৃতিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

"Withont misgiving, to be lost
A mile above the plain,
Enveloped in a mountain mist.
And the day dying.
Soundless, sightless, in the height,
Creatures of space we stood,
Defiant of the drums of fate
Patrolling through our blood."
—The Sound Within.

'The Musician at Rest' কবিতাটি J. E. Churchএর স্মৃতিতে লেখা। যিনি সুরকে রূপ দিতেন, তাঁর কণ্ঠ নীরব হয়ে গেছে চিরদিনের মত,—

"They have put him out of sound,
Into his silent sleeping place
Under the ground.'.

তবু যেন তাঁর সমাধির চারিপাশে অশ্রুত সঙ্গীত ভেসে বেড়াচ্ছে।

"How lovely the echo of music
That lingers about his grave,
Echo of the singing thoughts
He shaped and gave."

In After Years, The Difference, Then and Now, As Plato Says, An Exile, The Pagan, Night in Middle Life, Winter Gratitude প্রভৃতি কবিতাগুলির বিচার রসগ্রাহী পাঠক করবেন ; সবগুলির কথা বলতে গেলে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা।

Refutation কবিতাটি উদ্ধৃত করে' বইখানির পরিচয় শেষ করছি।

"I crumble in my fingers
This handful of sweet mould.
How passionate its savour,
I breathe it, and inspire
The life inherent,
The violet-promise,
The prophecy of wheat.
Here is my substance,
My lasting life :
Here is my strength
To challenge Plato
Who denied his own mother
In this handful of earth."

A Receiptএ কবি বলছেন

"Let the poem end
Serenely, and with grace."

তাঁর কবিতায় একথা সার্থক হয় নি কি ?

শ্রীশোভা সরকার

Psychology of Sex—by Havelock Ellis.—1933.

এখানি বিজ্ঞান পুস্তক। লেখক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, মনস্তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ এবং আধুনিক যৌনবিগ্যার প্রতিষ্ঠাতা। প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে এ সম্বন্ধে Studies in the Psychology of Sex নামে যে বৃহৎ সাত খণ্ড পুস্তক রচনা করেন তাতেই তিনি প্রসিদ্ধ হন। সে বই সাধারণের পক্ষে সহজলভ্য নয়, তবু অনেকে হয়তো পড়ে থাকবেন। এ নূতন বইখানি অনেকটা তারই সারমর্ম্ম, তাছাড়া ইতি-মধ্যে আরও যে সব অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে তাও এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। অথচ বইখানি ছোট করে লেখাতে একখণ্ডেই সমাপ্ত হয়েছে। বিশেষ করে ডাক্তারী ও বিজ্ঞানের ছাত্রদের এ সম্বন্ধে কিছু পড়ে রাখা দরকার, সেই উদ্দেশ্যেই এই manual for students রচিত হয়েছে। কিন্তু এভাবে বইখানি লেখাতে সাধারণের পক্ষেও ভাল হইয়াছে। আগেকার বই সাধারণের পড়বার উপযুক্ত ছিল না, কারণ মানুষের গোপন প্রবৃত্তির উদাহরণ দিতে গিয়ে তাতে যে সব আবর্জ্জনা ঘেঁটে বের করা হয়েছিল, সাধারণের মন সেই দিকেই কৌতূহলী হয়ে উঠতো,—তাতে আসল কথা চাপা পড়ে যেতো। লোকে ভাবতো মানুষ বুঝি ভিতরে ভিতরে এমনই ভয়ানক প্রাণী। এ বইয়ে সে সমস্তই ছেঁটে ফেলা হয়েছে। ইনি এখন স্পষ্টই বলেছেন যে যৌন ব্যাপারটা আমরা অতিরঞ্জিত করে বুঝেছি, আমাদের সে ধারণার সংশোধন করতে হবে। জিনিষটাকে

ঠিকমত বুঝতে হলে নিরপেক্ষ বিজ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে দেখা দরকার। আমরা বরা-বর জানি যে সৃষ্টিরক্ষার জন্য স্ত্রী-পুরুষের বিভাগ হওয়া প্রয়োজন,—নইলে প্রজনন হয় না। কিন্তু জীব-বিজ্ঞানে জানা যায় যে প্রজননের এই একমাত্র উপায় নয়, প্রকৃতির হাতে এ ছাড়া আরও উপায় আছে। জীবজগতে তার যথেষ্ট উদাহরণ। নিম্নস্তরের অনেক জীবের স্ত্রী-পুরুষ বিভাগ নেই,—একই প্রাণীর অংশবিশেষ অন্য অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিংবা আপনা আপনি বিভক্ত হয়ে তাদের বংশবৃদ্ধি হয়। মানুষের মধ্যে যৌনবৃত্তির আরোপ দেখে বোঝা যায় যে প্রজনন ছাড়াও তার অন্য উদ্দেশ্য আছে। সুতরাং প্রজননতত্ত্ব আর যৌনতত্ত্ব পৃথক জিনিষ, এবং পৃথকভাবে তার আলোচনা করা যেতে পারে। যৌন-সম্মিলন ছাড়াও যেমন প্রজনন হয়,—প্রজনন বাদ দিয়েও তেমনি যৌনসম্মিলন সম্ভব হতে পারে, এও দেখা যায়। তাতে কিছু অনিষ্ট হয় না, বরং অনেক সময় ভালই হয় এবং প্রজননক্রিয়াকে ইচ্ছাধীন করা যায়। এই সকল ধারণা থেকেই তার নানা রকম উপায় আবিষ্কৃত হচ্ছে ও সেটাকে সভ্যজগৎ গর্হিত বলছে না।

Sex penetrates the whole person ; a man is what his sex is। যৌনচৈতন্য মানুষের মজ্জায় মজ্জায়। রস বাদ দিয়ে রসগোল্লা যেমন কষ্টকল্পনা,—যৌনপ্রবৃত্তি বাদ দিলে মানুষও তাই। মানুষ যখনই ভাবে "আমি", তখনই সে ভাবে, হয় "পুরুষ-আমি", নয় "স্ত্রী-আমি"। বিশেষণটুকু বাদ দিয়ে বিশেষ্য হওয়াটা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু এই বিশেষণের অনেক সময় অদল-বদল হয়ে যায়, এবং এই অব্যবস্থিততাই জীবের স্বভাব। কে কখন পুরুষ কে নারী, তার ঠিক থাকে না। "There is no such thing as a purely male or female animal ; all animals contain elements of both sexes in some degree"। সুতরাং কাকে বলা যাবে পুরুষ, কাকে বলবো স্ত্রী ? এর সহজ উত্তর হচ্ছে, যার মধ্যে পুরুষ-বীজ আছে সেই পুরুষ, আর যার স্ত্রী-বীজ আছে সেই স্ত্রী। কিন্তু এখন আর সে কথাও বলা চলবে না। জীব-বিজ্ঞানের মতে একথা ভুল। এখানে এসে পড়ে ভ্রূণজীবনের কথা, যেখানে পার্থক্যের প্রথম সূত্রপাত হয়। ভ্রূণ প্রথম অবস্থায় থাকে ক্লীব, এবং একই জৈবকণা পুষ্টির তার-তম্যে পরে রূপান্তর গ্রহণ করে, নতুবা স্ত্রীভ্রূণ ও পুরুষ-ভ্রূণ বলে কোন পৃথক বস্তু নেই। এখানে পুষ্টির তারতম্য ঘটায় অণ্ডগ্রন্থি (Testes glands)। যেখানে অণ্ডগ্রন্থি দেখা দেয় সেখানে তার রসক্রিয়ার ফলে ভ্রূণ হয়ে যায় পুরুষ, যেখানে তার অভাব থাকে, সেখানে ভ্রূণ হয়ে যায় নারী। প্রথম প্রভেদের এই একমাত্র পদ্ধতি। এর মধ্যে অণ্ডগ্রন্থি যার শীঘ্র দেখা দেয় তার পৌরুষভাব প্রচুর থাকে, যার কিছু বিলম্বে আসে, পুরুষ হলেও তার কতকটা নারীভাব এসে পড়ে। আর এক গ্রন্থি এড্রিন্যাল—তাও কতক পৌরুষভাব আনে। যে ভ্রূণের মধ্যে অণ্ডগ্রন্থি নেই অথচ এড্রিন্যাল ক্রিয়াশীল, সেইগুলিই পুরুষভাবাপন্ন স্ত্রী হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, পুরুষ আর স্ত্রীর মধ্যে যে তফাৎ, তার মধ্যেও নানা রকম intersexual elements থাকে। এই থেকেই চরিত্রগত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি,—বলা যেতে পারে এ সব গ্রন্থিরসের লীলা। কেবল জন্মকালে নয়, মানুষের জীবনভোরই প্রণালীবিহীন গ্রন্থিগুলি (Ductless glands) নিত্য রস সরবরাহ করতে থাকে, এবং তারই

সামঞ্জস্যের দ্বারা মানুষের চরিত্রের ওজন বজায় থাকে। কারণ রস দুরকমের হয়, উত্তেজক (hormones) আর দমনকারক (chalones)। এই দুই প্রকার রসের প্রভাবে স্নায়ুমণ্ডলীও দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে—Sympathetic ও Parasympathetic। রস ও স্নায়ুর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, কখনও রস চালায় স্নায়ুকে, কখনও স্নায়ু চালায় রসকে। অতএব মানুষের মনের কল তৈরী হয়েছে স্নায়ু আর গ্রন্থি দিয়ে।

বিজ্ঞানের এই সব নূতন তত্ত্ব। দেখা যাচ্ছে মানুষের বিচিত্র চরিত্রের জন্য গ্রন্থিগুলিই কতকটা দায়ী। কিন্তু কেবল তাই নয়, মানুষের সামাজিক শিক্ষা দীক্ষারও দায়িত্ব আছে। আগেকার চেয়ে যৌনবিকৃতি এখন বেশী দেখা যাচ্ছে, তার কারণ আগেকার সভ্যতা ছিল সরল, এখনকার সভ্যতা জটিল। একদিকে যেমন বেড়েছে প্রলোভন ও উত্তেজনা, অন্যদিকে তেমনি বেড়েছে নানা রকম বাধা বিঘ্ন। কিন্তু মানুষ তবু সেই আদিম জন্তু। কাজেই ভিতরে ভিতরে চলতে থাকে দ্বন্দ্ব। এর ফলে মানুষ যা হয়ে ওঠে তা আমরা নিত্যই দেখতে পাই। তাই বলে কিন্তু যেখানেই দেখবো মানুষের যৌনবৃত্তির মামুলি নিয়ম বজায় নেই, যেখানেই কিছু স্বাতন্ত্র্য দেখা যাবে, সেখানেই তাকে বলবো perverse বা বিকৃত, এটা ঠিক নয়। Abnormality বা অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত হয়ে আছে। জীবজন্তুর মধ্যেও নানা রকম বিকৃতি দেখা যায়, সেগুলি স্বাভাবিক। মানুষেরও যে সকল বিকৃতি হয়, তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলেই বুঝি তার অধিকাংশই স্বাভাবিক—, অর্থাৎ স্বোপার্জ্জিত (acquired) নয়, জন্মগত (congenital)। অতএব দোষ দেওয়া চলে না,—তাকে সহজ বলেই মানতে হয়। এই কথাটাই নূতন করে শিখতে হবে যে মানুষের যৌন অভিব্যক্তি মাত্রেই সহজ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা অতিরিক্ততা-দুষ্ট না হয়। অতিরিক্ততাই অস্বাভাবিক—এবং সেটা বেশীর ভাগই কৃত্রিম সামাজিক দমননীতির অতিরিক্ততার প্রতিক্রিয়া। বাধা না থাকলে এ বিপত্তিও থাকতো না। বাধা আছে বলে যেটা ঢাকা দিতে যাই, সেটা নানাভাবে স্নায়ুবিপর্য্যয় ঘটায়,—বাঁধ দিয়ে বানের জল রোধ করলে যেমন তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মোটামুটি তাকে বলি স্নায়ুদৌর্ব্বল্য—আর স্নায়ু বিগ্‌ড়ে গেলে গ্রন্থিও বিগ্‌ড়ে যায়। বাড়াবাড়ি হলেই তখন সেটা রোগ—তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। ঔষধের দ্বারা গ্রন্থিগুলিকে কতক সাম্‌লানো যায় বটে কিন্তু এর আসল চিকিৎসা হচ্ছে চাপা দেওয়া মনকে মুক্তি দেওয়া ও বাধা-দ্বন্দ্বের যত কিছু ইতিহাস খুঁজে খুঁজে বের করা। সমস্ত রুদ্ধ কথা যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে তখনই মানুষ শাপমুক্ত হয়। গোপন পাপ প্রকাশ হলে তা আর পাপ থাকে না। Freud থেকে আরম্ভ করে আমাদের গিরীন্দ্রশেখর পর্য্যন্ত এই চিকিৎসাই করে থাকেন। কিন্তু তাতে ত সকল মানুষের দুঃখ ঘোচে না! দুঃখ ঘোচে Preventionএর দ্বারা,—অর্থাৎ আগে থেকে সাবধান করে দিলে।

এজন্য গোড়া থেকে,—অর্থাৎ ছেলেবেলা থেকে কাজ সুরু করতে হয়। ছেলেবেলা থেকেই অল্পে অল্পে আমাদের যে ইন্দ্রিয়চৈতন্য জন্মায়,—তা পুষ্ট হয়ে ওঠে কতকগুলি কুশিক্ষা ও ভুল ধারণার ভিতর দিয়ে। ছেলেবেলায় খেলাচ্ছলে যা করা হয় সেগুলো তত দোষের হয় না,—যত হয় চারদিক থেকে তা পাপ বলে জানিয়ে দেওয়াতে। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আমরা জিনিষটার ওপর রং লাগিয়ে এমন

বিকৃত করে ফেলি যে তাকে রং ছাড়িয়ে সহজ করে আনতে অনেক বয়স কেটে যায়। ইন্দ্রিয়সম্পর্ক মাত্রকেই আমরা যেভাবে গোপন করে রাখি,—আর তার থেকে এর যে অর্থ দাঁড়িয়ে যায় সেটাই মস্ত ভুল, এবং ছেলেবেলা থেকেই সে ভুলের সুরু। আমরা এই শিখি ও শেখাই যে জিনিষটা উপভোগ্য কিন্তু অত্যন্ত গর্হিত—কারণ এতে স্বাস্থ্য ও মনের হানি হয়। মনের হানি অবশ্য মন থেকেই তৈরী করা, কিন্তু এতে স্বাস্থ্যের বাস্তবিক হানি হয় না। একথা হ্যাভলক এলিস্ প্রমাণ করে দিয়েছেন। এটা ভাল করে দেখিয়েছেন যে ইন্দ্রিয়ের অতিব্যবহারে অনিষ্ট হয়,—অব্যবহারেও কিছু ক্ষতি হয়, কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত সহজ ব্যবহারে কোনো ক্ষতি হয় না,—বয়সকালেও না, ছেলেবেলাতেও না। উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন বর্ব্বর মানুষদের জীবন। নিউ গিনির ট্রোব্রিয়াণ্ড দ্বীপের অধিবাসীরা ছেলে মেয়েদের উলঙ্গ রাখে, একসঙ্গে মিশতে কোনো বাধা দেয় না, তাদের সুমুখে যৌনবিষয়ের কথা বলা অশ্লীল বলে কেউ বিবেচনা করে না, এমন কি দরকার হলে তাদের কাছে বাপ মায়েরা নিজেদের আচ্ছাদন সম্পূর্ণ খুলে ফেলতেও দ্বিধা করে না,—অর্থাৎ এ সম্বন্ধে বিশিষ্টভাবে কিছু গোপন করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। আর ছেলেবেলা থেকে এইভাবে অভ্যস্ত হয়ে তাদের কাছে কিছুই রহস্যময় থাকে না। তাই তাদের মন থাকে সুস্থ এবং অশ্লীলতা সম্বন্ধে অচেতন। তাই বলে তাদের শালীনতার অভাব আছে বা শ্রদ্ধা সমীহ নেই একথা মনে করলে ভুল হবে। এসব হচ্ছে মনের ধর্ম্ম, কোনো সামাজিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। এদের স্নায়ুদৌর্ব্বল্য মোটেই নেই। ছেলেবেলায় যা কিছু করে, বয়স হলে তা ভুলে যায়। কিন্তু যেহেতু আমরা একে পাপ বলে জানি, সেইজন্য তার দাগ বুড়োবয়স পর্য্যন্ত আমাদের মনে লেগে থাকে। অন্য প্রাণীরাও যেটাকে সহজভাবে দেখে, আমরা বুদ্ধিমান জীব তাকে দেখি বাঁকাভাবে। আমাদের পুরুষানুক্রমে এমনি চলছে—এবং তজ্জনিত বিকৃতি বংশগত দোষের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

এই ভুল ভাঙ্‌তে হলে বর্ত্তমান সামাজিক চাল বদলাতে হবে। ছেলেদের কুশিক্ষার বদলে সুশিক্ষার উপায় করতে হবে, আর ছেলেদের বাপ মায়েরাই তার ভার নেবেন। ছেলেরা বাপ মায়েরই কাছে প্রথম এ-সব কথা জানতে চায়। এটা তাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি। এতে বাধা দিয়ে কিছু লাভ নেই, যখন জানবেই তখন যতটা সম্ভব সহজভাবে অল্পে অল্পে জানিয়ে দেওয়াই ভাল। এ-ছাড়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে মিথ্যা লজ্জার প্রশ্রয় না দিয়ে কিছুক্ষণ করে তাদের উলঙ্গ হতে দেওয়া ও তাদের কোনো অসভ্য আচরণ দেখলে নিষ্ঠুর পীড়ন করে তাদের মনে ভয় জন্মে না দিয়ে ভাল কথায় তাদের বুঝিয়ে দেওয়া ভাল। এ-সকল কেবল এলিসেরই মত নয়,—Bertrand Russelও এ কথা বলেছেন, ও আজকালকার অনেক মনীষী লোক এই কথা বলছেন। এমন কি "how a baby is born; what every child should know" প্রভৃতি অনেক বইও বেরিয়েছে। অনেক child guidance clinicও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু মানুষ যখন যে কথা প্রথম বলতে আরম্ভ করে, তার অনেক কাল পরে সে কাজ করতে আরম্ভ করে। বলতে বলতে হয়তো অনেক দিন কেটে যাবে। কিন্তু তার পর হয়তো এমন দিন আসবে যখন অশ্লীলতা বলে কিছু কথা থাকবে না,—তা চাপা দেওয়ার জন্য কেউ ব্যস্তও হবে না।

অস্বাভাবিক বিকৃতিগুলির আলোচনার পর ইনি মানুষের স্বাভাবিক যৌনবৃত্তির আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে ভালবাসা বৃত্তিটি বড় স্থান পেয়েছে। পূর্ব্বে এটা কবিদেরই সম্পদ ছিল, কোনো Psychologyর বইয়ে এর স্থান ছিল না। কিন্তু এখন সে দিন নেই। ভালবাসা এখন আর্ট হিসাবে মনস্তত্ত্ববিদের আলোচ্য। আজকাল অনেকে বলে থাকেন ভালবাসা একটা কথার কথা, খুঁজে দেখতে গেলেই বেরিয়ে পড়ে মেকি। কিন্তু ইনি বলেন যে জিনিষটা দামী বলেই তার এত মেকি বেরোয়, যেমন আসল হীরা দামী বলে বাজারে তার এত রকম মেকি। মানুষের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি ভালবাসা। Physiologyর ভাষায় একে বলা হয়—sexual instinct manifested through cerebral centres। ইনি বলেন এতে আসল কথাটা বাদ গেল। ভালবাসার মধ্যে নানারকম শরীরসম্পর্ক প্রভৃতি তো আছেই, তা ছাড়া আরো কিছু আছে। স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসায় যৌনসম্বন্ধটা কিছুদিনের মধ্যেই পিছিয়ে পড়ে যায়, তার পর দেখা যায় যে মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, এও সেই একই জিনিষ। মানুষের জীবনে এ এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তি, এর আখ্যা দেওয়া কঠিন। Love is difficult to define as life itself and probably for the same reasons. In all its forms love plays a part in society only less importaut than that of the instinct to live। অপরকে ভালবাসা ছাড়া আর কিছুতে মানুষ নিজের সত্তার উপলব্ধি করতে পারে না। Struggle for existence অর্থাৎ স্বার্থরক্ষাই জীবের ধর্ম্ম, কিন্তু তার চেয়ে বৃহত্তর ধর্ম্ম হচ্ছে প্রেম, যার দ্বারা স্বার্থ সার্থক হতে পারে। এই প্রেমের একটা অবলম্বন চাই—অর্থাৎ এটা দ্বিতীয় ব্যক্তি সাপেক্ষ। আর কোনো-না-কোনো আকারে সেই প্রেম মানুষের চাই, নইলে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না।

এ সম্বন্ধে ইনি যে কথা বলেছেন তা একেবারে কবির মতই শোনায়—There can be no self without others and the craving for others, and we can not put aside others and the emotions which others excite without first putting aside the self. So that properly speaking love is involved in life and if love is an illusion, then life itself is an illusion"। অতবড় বৈজ্ঞানিকের মুখে এ কথা শুনলে অনেকটা আশা হয়।

এর পরই আছে বিবাহের কথা—অর্থাৎ প্রেমকে স্থায়ী আশ্রয় দেবার পাকাপাকি বন্দোবস্ত। অপর পক্ষে, সৃষ্টিরক্ষা বজায় করে একজোড়া মানুষের স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের জন্য আইনকানুন ঘেরা বাঁধা-রাস্তা। বহুকাল থেকে মানুষের সমাজে এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে এবং আজ পর্য্যন্ত তা টিঁকে রয়েছে, যেহেতু এটা মানুষের প্রকৃতিগত naive desire to assist Nature by adding to what is normal the categorical imperative of custom and law। কিন্তু বিবাহ যে কেবল যৌনসম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যেই করা হয় আর একদিনের মধ্যেই সে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এ কথা যেন কেউ মনে না করেন; "Marriage is much more than a sexual relationship. There are many marriages in which no sexual relationship ever takes place. It is as so many investigations show, compatibility which is the chief clue to satisfaction in marriage"—অর্থাৎ আসলে এটা একটা হৃদয়জয়ের ব্যাপার। একজন চেতন মানুষকে আর একজন অপরিচিতের আত্মীয় করে তুলতে বিস্তর মেহনৎ ও সময়ের দরকার,—বিশেষতঃ আজকালকার দিনে দুজনের কেউই যখন বোকা নয়। এ-কথাটা বিশেষ করে মনে বুঝে রাখা দরকার। নইলে যে দিন বিবাহের গাঁটছড়া বাঁধা হবে তার পর থেকেই স্ত্রী অমনি স্বামীকে ডাকবে "জীবনবল্লভ" বলে,—এই প্রত্যাশা নিয়ে যিনি বিবাহ করেন তাঁকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। বিবাহ হচ্ছে একটা সাধনা,—একটা বিশেষ আর্ট,—এবং বহুদিনের পর তাতে সাফল্য মেলে। "Marriage is really an achievement and often a very slow achievement. It can not be reached at a bound. Years may be needed before a relationship called marriage in the full and deep sense is achieved"। এই কথাটা আগে থেকে না জানার দরুণ মানুষের অনেক অশান্তি জন্মায়, এবং তাই থেকে সংসারে নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়।

অনেকে বলে থাকেন, বিবাহে কোন সুখ নেই। আজকাল অনেক সময় দেখা যায় বাস্তবিক সেটা সত্য কথা। কিন্তু এলিস বলেন যে এতটা হোতো না যদি society did not so often disturb the vision of the young and misguide their first steps। আগে থেকে সমস্ত জেনে শুনে প্রস্তুত হ'য়ে যদি বিবাহ করা যায় তা হলে এ রকম অশান্তিও হয় না, এত ডাইভোর্স ও হয় না। দোষ অনুষ্ঠানের নয়, দোষ মানুষের নিজের।

বিবাহ করে সত্য সত্যই মানুষ সুখী কিংবা অসুখী তা জানবার জন্য এক হাজার বিবাহিত নরনারীর জীবন-বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করা হয়েছিল। জানতে পারা গেছে যে তাতে স্বামীদের মধ্যে শতকরা ৫১জন ও স্ত্রীদের মধ্যে ৪৫ জন সুখী, বাকী অসুখী। অবশ্য বিবাহে কতটা সুখ আশা করতে পারা যায় এ সম্বন্ধে সকলের ধারণা একরকম নয়। যাকে মনে করা যায় অসুখী তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় সে হয়তো ভুল বোঝে, কিংবা ভুল বলে, কিংবা দুবার দুরকম বলে। ইনি বলেন—Even when marraige remains imperfect, we find on deeper insight in most cases that many compensations have been achieved। বিবাহে মিল হতে অনেক সময় লাগে বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বেশীর ভাগ একরকম করে আপোষে মিল হয়েই যায়।

বিবাহের বয়স সম্বন্ধে এঁর মত যে বেশী বয়স অপেক্ষা কম বয়সে বিবাহই ভাল। অনেক পরীক্ষা করে তিনি বলেছেন যে বেশী বয়সে শরীর মন দুইই পেকে যায়, তখন দুটি কঠিন পদার্থকে একসঙ্গে জোড়া কঠিন হয়। নরম থাকতে থাকতে জুড়লে ভাল জোড় খায়। শরীরের তরফ থেকেও বলা যেতে পারে যে অল্প বয়সে প্রসবের কষ্ট হয় না, কিন্তু বেশী বয়সে হাড় শক্ত হয়ে যাবার পর প্রথম প্রসব বড় কষ্টের হয় ও প্রায়ই তাতে বিপদ ঘটে। কোন্ বয়স বিবাহের উপযুক্ত প্রকৃতি তার সীমা নির্দ্দেশ করে দিয়েছে—আমাদের সেটা মানা উচিত। It is a mistake to suppose that early adolescence is unfavourable. Nature has fixed the time limit at puberty. When we postpone the relationship to a still later period, we lay up for ourselves troubles."

অবিবাহিত ও বিবাহিত জীবনের পরস্পর তুলনা করে ইনি বলেন বিবাহিত জীবনই মোটের উপর ভাল। মনুষ্যজীবন সম্পূর্ণ উপভোগ করতে চাইলে বিবাহ করাই যুক্তিযুক্ত। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা"—এ কথা বাদ দিয়েও বিবাহের অন্য তাৎপর্য্য আছে। নিজের স্বার্থের মধ্যে মানুষ যখন আর একজনকে জড়িয়ে নেয়,—তখন স্বার্থবুদ্ধির অতীত হ'য়ে মানুষের জীবনে যে একটা নূতনতর হেতু এসে দেখা দেয়,—আর তা থেকে জীবনের যে নবতর উন্মেষ ঘটতে থাকে,—সেটা মানুষের উপলব্ধি হওয়া দরকার, কিন্তু বিবাহ ছাড়া আর কিছুতে তা হয় না। আমরা একে বলি "সংস্কার"। পূর্ব্বকালে দার্শনিকরা যুক্তিতর্কের দ্বারা যে সংস্কার মানুষের কর্ত্তব্য বলেছিলেন, আর এখনকার বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষদৃষ্টির ভিতর দিয়ে যে স্বতঃসিদ্ধে এসে উপস্থিত হয়েছেন,—দুদিক থেকে সেই একই কথা। "There can be no doubt whatever that this condition even in the absence of children leads to the richest and deepest life experience."। এর মধ্যে অনেক দুঃখ আছে তা ঠিক, কিন্তু দুঃখের মধ্য দিয়ে ছাড়া জীবনের আস্বাদ মেলে না। সবই যদি সরল ও সুখের হোতো তা হলে it would be a feeble image of the world failing to give satisfactions to those who have drunk deeply of life।

অনেকে বলেন মানুষের যে সহজ শক্তি আছে, তা এই এক পথেই খরচ না করে যদি তাকে অন্য দিকে নিয়োগ করা যায়, তাতেও জীবনের উপভোগ হতে পারে, অথচ পৃথিবীর অনেক কাজ হয়। কিন্তু এক ভাবের instinctকে অন্য ভাবে খাটানো, যাকে বলা হয় sublimation বা পর্য্যাবেশন, সে বড় শক্ত এবং তাতে অযথা অনেক অপচয় হয়। Dynamic forceকে অবশ্য নিষ্ক্রিয়ভাবে চেপে রাখা যায় না, তাতে নানা অনিষ্ট ঘটে। আর একে যত বড় উঁচুদরের কাজে লাগানো যাক—কৃত্রিম প্রয়োগ হেতু তাতে অতিরিক্ত শক্তিক্ষয় ও অবসাদ ঘটে। বয়লারে যতটা ষ্টীম উৎপন্ন হয়, তার অল্পটুকুই এঞ্জিন চালানোতে খরচ হয়, বাকী অনেকটা নীচুপথে অনর্থক নিকাশ হয়ে যায়। এঞ্জিন ষ্টীমের উপযোগী হওয়া দরকার।

আরও অনেক কথা ইনি বলেছেন যে সব কথা এখানে আলোচনা করা সম্ভব হয় না। ইনি বলেন আজকাল সাধারণের পক্ষে এ সকল বিষয় শিখে রাখা ভাল। এখনকার দিনে এটা শিক্ষার জিনিষ বলেই মনে করতে হবে—It is certain that in civilisation such knowledge has to be taught। আর এ সম্বন্ধে কারোই দ্বিধা থাকা উচিত নয়,—we should not be ashamed to speak of what God was not ashamed to create। সাধারণে এসব কথা না বুঝতে পারলে প্রায় ডাক্তারদের কাছে যায়। সেইজন্য আজকালকার ডাক্তারদেরও এগুলি জেনে রাখা উচিত, সে কথা বার বার করে বলেছেন। শরীর-বিদ্যা সম্বন্ধে সব শিখে এ বিদ্যার কিছু না জানলে মস্ত একটা ফাঁক থেকে যায়। আজকালকার দিনে তাতে চলে না। তাতে রোগীর আসল রোগ ধরা যায় না, চিকিৎসায় ভুল হ'তে পারে এবং আনাড়ির মত উপদেশ দিয়ে নানারকম ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে। Preventive Medicine হিসাবে এ-বিদ্যা তাদের আয়ত্ত করা দরকার।

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

মহাপ্রস্থানের পথে—শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল
প্রকাশক আর্য্যাপাবলিশিং হাউস্।

সাধারণতঃ ভ্রমণকাহিনী বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি মহাপ্রস্থানের পথে সেই জাতীয় পুস্তক নহে। মাসিক পত্রিকার পাতায় সাধারণতঃ যাত্রীদের সুবিধা অসুবিধার তালিকা, না হয় লেখকের গৃহীত ফটোগ্রাফ্‌এর সাহায্যে নৈসর্গিক দৃশ্যের বর্ণনা থাকে। এই সব বৃত্তান্তের একমাত্র আকর্ষণ ফটোগ্রাফ-গুলির। বলাবাহুল্য, এই প্রকার মোটরে কাশ্মীর যাত্রা অথবা সাইকেলে ভূ-প্রদক্ষিণ লেখকদের ঐশ্বর্য্য কিম্বা সাহসের পরিচায়ক হইলেও সাহিত্যপদবাচ্য নয়। বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্যে একাধিক ভ্রমণকাহিনী সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের লেখাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু তাঁহার লেখার মধ্যেও দুই তিন প্রকারের দৃষ্টিভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়।

তাঁহার "ইউরোপ প্রবাসীর পত্রে" তিনি ছিলেন ইউরোপীয় সভ্যতার ছাত্র এবং সমালোচক, 'জাপানযাত্রী' এবং 'যাত্রী'তে তিনি হইলেন দার্শনিক। পারস্যদেশের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তিনি দুইটি বিভিন্ন সভ্যতার ঘটক। রবীন্দ্রনাথের পরে যাঁহারা ভ্রমণকাহিনী লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, একমাত্র জলধর সেন মহাশয় ব্যতীত আর সকলেই রবীন্দ্রনাথের কোনো না কোনো যুগের লিখন-ভঙ্গীর অনুগামী। অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে' এই শ্রেণীর লেখার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য সাহিত্য রচনা।

প্রবোধবাবুর পুস্তকখানিতে কোনো পূর্ব্ববর্ত্তীদের ভঙ্গী অনুকৃত হয় নাই ইহা তাঁহার লেখার একটি বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য গুণের মধ্যে তার সুললিত স্বচ্ছন্দ মসৃণ ভাষাও উপভোগ্য। কিন্তু তাঁহার রচনার প্রধান গুণ এই যে তাহার বৃত্তান্তে একটি শিক্ষিত ভদ্র ও আধুনিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই লেখকের কাছে কোনো অন্ধ ভক্তির আহ্বান আসে নাই, পথ চলার নেশা তাঁহার মনকে অধিকার করিয়াছিল। পথের কষ্ট সহ্য করিবার যে প্রেরণা তিনি পাইয়াছিলেন, তাহার উৎস ধর্ম্ম-প্রাণতা নহে, অজানা ও দুর্গম স্থানের প্রতি সহজ আকর্ষণ। হিমালয়ের পথে তীর্থের সন্ধান অপেক্ষা সহযাত্রীদের সাহচর্য্য তাঁহার নিকট বেশি মূল্যবান ছিল। বইখানি পড়িলে মনে হয় তিনি বিশুদ্ধ পর্য্যটক এবং তাহার মন উন্মুক্ত ও সজাগ!

কিন্তু আমার মনে হয়, যেখানে কেবলমাত্র যাত্রার আনন্দ সেখানে অতি শীঘ্র অবসাদ আসিয়া পড়ে। মনে হয় যে, প্রবোধকুমার মানব জীবনের অপরিসীম সম্ভাবনায় আস্থা রাখেন। আদর্শবাদীর নিকট, সাহিত্যে ও জীবনে "স্বর্গরাজ্যের" প্রতিষ্ঠা-কল্পনা স্বাভাবিক কিন্তু সেই সূত্রে যদি অতি পুরাতন সামাজিক সমস্যা আসিয়া পড়ে তাহা হইলে সেটি একটু অবান্তর ঠেকে। মাঝে ঈষৎ একটানা মনে হইলেও উপক্রমণিকা হইতে পরিশেষ পর্য্যন্ত কাহিনীর রূপটি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ প্রবন্ধাকারে আরম্ভ হইয়া শেষে ইহা উপন্যাসের আকার ধারণ করিয়াছে। সে যাহাই হউক্ দুই রূপই সাহিত্যের।—ইহাই বোধহয় পাঠক পাঠিকার নিকট যথেষ্ট।

শ্রীছায়াদেবী

The Inter-pretation of the Atom—By Professor F. Soddy—(John Murray).

রেডিয়াম প্রভৃতি ধাতুর রশ্মিক্ষরণ আবিষ্কৃত হবার পর রসায়ণশাস্ত্র এক নূতন কলেবর লাভ করেছে। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রচুর বই প্রকাশিত হলেও শেষোক্ত বিষয় সম্পর্কে তেমন কোন বই প্রকাশিত হয় নি। The Interpretation of the Atom মূলতঃ এই অভাব দূর করবার জন্য লেখা। এ কাজের জন্য গ্রন্থকারের চেয়ে যোগ্যতর লেখক পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। রেডিয়াম আবিষ্কারের প্রথমাবস্থায় সডি স্বয়ং ও রাদারফোর্ডের সহযোগিতায় এই বিষয়ে নানা মূল্যবান আবিষ্কার করে বিষয়টির খুব উন্নতিসাধন করেছিলেন ও ১৯২১ অব্দে কেমিষ্ট্রিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। ছুটি বিশিষ্ট আবিষ্কার Isotopes ও Displacement Law সডির দ্বারাই সাধিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে উদ্দেশ্য নিয়ে বইখানি লেখা তা সুচারুরূপেই সম্পাদিত হয়েছে। কেমিষ্ট্রি, পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জেনেও এই বইটি ধৈর্য্য ধরে পড়া ও এর সারসংগ্রহ করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে রাদারফোর্ডের দু' তিন বছর পূর্ব্বের প্রকাশিত বই—Radiations from Radioactive Substances এতই তথ্য ও তত্ত্বসঙ্কুল যে তার অনুধাবনা করা বৈজ্ঞানিক ও ছাত্র সমাজেই শোভা পায়, সাধারণের নয় ; তা ছাড়া রাদারফোর্ডের বইটি পদার্থ বিজ্ঞানেরই অঙ্গীভূত, রসায়ণ সম্পর্কিত ব্যাপার তাতে অতি অল্পের মধ্যে সারা হয়েছে।

আজ পর্য্যন্ত যে সকল ব্যাপার মানবের জ্ঞানলিপ্সা ও বিচারের বিষয় হয়ে এসেছে তার মধ্যে দু'একটি ছাড়া পদার্থের মূল উপাদানের তুল্য আর কোন প্রহেলিকাময় প্রাচীন জিজ্ঞাসা আছে কিনা সন্দেহ। মনে হয় বহুকাল থেকেই অন্ততঃ একশ্রেণীর লোকের বিশ্বাস ছিল যে পদার্থজগৎ অখণ্ড বস্তুর খেলা নয়, দর্শনাতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডের সমষ্টিতে গঠিত। প্রাচীন যুগে প্রথম বৈশেষিক সূত্রকার (কণাদ) সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে প্রত্যেক পদার্থের মূলে রয়েছে সেই পদার্থের অদৃশ্য, অবিভাজ্য নিত্যদ্রব্য—অনু। পদার্থের রূপ গন্ধ স্পর্শাদি সমস্ত লক্ষণ এই মূল অনুরই সমষ্টিগত লক্ষণ। এই মূলগত লক্ষণ ছাড়া আর এক শ্রেণীর লক্ষণের কথা কণাদ উল্লেখ করে গেছেন যা পদার্থ লাভ করে সংযোগ বিয়োগ ও সমবায় ফলে। বৈশেষিক সূত্রকারের এই অনু ও আধুনিক বিজ্ঞানের Molecube এক। সংখ্য সূত্রেও অনুর কথা সবিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। Lucretius ও অনুকেই পদার্থের মূল উপাদান বলে স্থির করেছিলেন। আজকালকার বীক্ষণাগার ও যন্ত্রপাতির তুল্য কোন ব্যবহারিক সাহায্য ব্যতিরেকেও কেবল সাধারণ পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচন করে প্রাচীন দার্শনিকেরা যে কত খাঁটি নির্ভুল বৈজ্ঞানিক তথ্যে উপনীত হতে পেরেছিলেন তা ভেবে বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয়। এমন বহুবার দেখা গেছে যে পূর্ব্বে যা শুধু মানবের কল্পনাতেই উদিত হয়েছে তা পরে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে গৃহীত হয়েছে। বাস্তবিক বিজ্ঞানের অনেক সম্পদবান আবিষ্কার যৌক্তিকতার ফলে আরব্ধ না হয়ে হয়েছিল স্পর্দ্ধান্বিত কল্পনাবলে—যে সব কল্পনা আবিষ্কারের বহু পূর্ব্ব থেকেই সূচিত হয়েছিল। কেউ কেউ এমন মনে করতে সুরু করেছেন যে এই বিশ্ব-নিখিলের আদি সত্ত্বা মন বা জ্ঞান জাতীয়, তাই যা কিছু আছে ও সম্ভব তার কল্পনা

মানসে আপনাহতেই জাগরিত হয়। এক সময়ে পারদকে সোনায় বা হীন ধাতুকে
শ্রেষ্ঠতর ধাতুতে রূপান্তরিত করার কল্পনা করে অনেক জ্ঞানী গুণী অনেক কাঠখড়
পুড়িয়েছিলেন ও লোকসমাজে উৎপীড়িত ও উপহসিত হয়েছিলেন, আর আজ রেডিয়াম
প্রভৃতি ধাতু থেকে অন্য ধাতুতে রূপান্তরগ্রহণ চোখের সামনেই আপনাথেকে সম্পাদিত
হচ্ছে। কে বলতে পারে আরও কত অন্ধ বিশ্বাস একদিন বৈজ্ঞানিক সত্য বলে
প্রমাণিত হবে না।

Atomic Theory এখন বিজ্ঞানের বিগত যুগের কথা। বইটিতে যে
প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে সেটা বিজ্ঞানের আধুনিক যুগের, সেটা atom বা অনুর
গঠন পদ্ধতি। এটুকু বোধ হয় বলা ভাল যে প্রাচীনেরা যে পর্য্যন্ত পৌছেছিলেন
সে হল mobcules বা অণু,—পরবর্ত্তীরা অর্থাৎ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা
যতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন তা হল atom বা পরমাণু ও মৌলিকপদার্থ
elements। এর পর আবার বিজ্ঞান নূতন করে যতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছে তাই
হল বইখানির আলোচ্য বিষয়। নব্যবিজ্ঞান মতে মৌলিকপদার্থ একেবারে মৌলিক
নয়। মৌলিকপদার্থের আদিতে রয়েছে proton ও electron, সম-তড়িৎকণা ও
বিষম-তড়িৎকণা, এদেরই বিভিন্ন সমবায়ে বিভিন্ন মৌলিকপদার্থের সৃষ্টি। অণুর
কেন্দ্রীয় স্থানে এই দুই প্রকৃতির তড়িৎকণা কতকগুলি মিলে জমাট বেঁধে থাকে,
সেটাকে বলা যেতে পারে কেন্দ্র-পিণ্ড, আবার এরই চতুর্দ্দিকে আর কতকগুলি বিষম
তড়িৎ-কণা পরিভ্রমণ করে বেড়ায়। এই আধুনিক তত্ত্বের সূত্রপাত হয়েছে রেডিয়াম
প্রভৃতির ধাতুর আচরণ থেকে। সডি তাঁর বইখানির প্রথমার্দ্ধ এই সকল ধাতুর ও
তাদের রশ্মিক্ষরণের বিবরণ দিয়ে পূর্ণ করেছেন। এমন চিত্তাকর্ষক বিষয় বিজ্ঞানে
আর দুটি আছে কিনা সন্দেহ। এখানে ঐ বিবরণের সংক্ষিপ্তসার দেওয়াও প্রায়
অসাধ্য। খুব সাধারণ ভাবে ও সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে এই সব ধাতু আপনাহতেই
তিনপ্রকার রশ্মিক্ষরণ করে ও ফলে এক মৌলিক পদার্থ থেকে অন্য মৌলিক পদার্থে
রূপান্তরিত হয়। রশ্মিগুলি হল সমতড়িতাণুর ঝাঁক, বিষমতড়িতাণুর ঝাঁক ও xray
তুল্য একরকম আলোকরশ্মি। অবশ্য এগুলি সমান ভাবে বিক্ষিপ্ত হয় না, পরিমাণের
ইতরবিশেষ আছে। সম তড়িতাণুক্ষরণের ফলে ধাতু একধাপ নীচের মৌলিকপদার্থে
উপস্থিত হয়, বিষয় তড়িতাণুক্ষরণের ফলে একধাপ উপরের মৌলিকপদার্থে উন্নীত হয়।
এরই নাম Displacement law। এই রকমে ইউরেনিয়াম ধাতু ৫।৬ ধাপ ওঠা
নামা করে রেডিয়ামে ও রেডিয়াম আট নয় ধাপ ওঠানামা করে সীসকে এসে হাজির
হয়। সমস্তটাই স্বস্ফুরিত, স্বপ্রবর্ত্তিত, কোন উপায়ে এর গতিবিধি পরিবর্ত্তিত করা
যায় না। সে যাই হ'ক প্রাচীন লোকেরা যে পারদ থেকে সোনা লাভ করার স্বপ্ন
দেখতেন সে কি এই সব স্বপ্রবর্ত্তিত ব্যাপার থেকে খুব তফাৎ? এতদিন একরকম
তাই ধারণা ছিল বটে,—অর্থাৎ এতদিন মনে করা হত যে আপনা হতে যখন পারদ
সোনা হচ্ছে না তখন কে এই অসাধ্য সাধন করতে পারবে। কিন্তু গত বৎসর কৃত্রিম
উপায়েও ধাতু থেকে এই রকম সম ও বিষম তড়িতাণুক্ষরণ করা গেছে। সুতরাং
এক ধাতুকে কৃত্রিম উপায়ে রূপান্তরিত করা একেবারে নিছক স্বপ্ন নাও হতে পারে।
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ধাতুথেকে এই রশ্মিক্ষরণ সৃষ্টির একটা বিপরীত ক্রিয়া,
সুতরাং এটা ও অনুমিত হয় যে ঘটনাচক্রের যোগাযোগে যেমন আপনাহতেই মৌলিক

পদার্থের স্বতঃপ্রবর্ত্তিত ধ্বংস সাধন হচ্ছে তেমনি নিশ্চয় এমন কোন যোগাযোগ এক সময়ে হয়ে ছিল যখন মৌলিকপদার্থের সৃষ্টি সম্ভাবিত হয়েছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এ ব্যাপারে আমরা সৃষ্টি ও ধ্বংসলীলার সম্মুখীন হয়েছি। পণ্ডিতেরা এখন মনে করেন যে সমস্ত মৌলিকপদার্থই হাইড্রোজন থেকে সম্ভূত অর্থাৎ এঁরা মনে করেন যে সম ও বিষম তড়িৎকণা যদৃচ্ছা একজোট হয়ে মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে না। তৎপরির্ত্তে প্রথমে দুটি হাইড্রোজেন অণু ও দুটি বিষম তড়িৎকণা একত্র যুক্ত হয়ে একটি হিলিয়াম কেন্দ্র উৎপন্ন করে, পরে এই হিলিয়াম কেন্দ্রের সমবায়ে অন্যান্য মৌলিকপদার্থের কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ব্যাপারটা যেরকম সহজভাবে বর্ণিত হ'লে আসলে অবশ্য সেটা অত সহজ নয়। যা হক নব্য বিজ্ঞান পর্য্যালোচনার ফলে একটা খুব অভাবনীয় কাজ শেষ করা হয়েছে, সে হ'ল এই যে যত রকম মৌলিক পদার্থ বিশ্বে তৈরী হতে পারে তার ফর্দ্দ করে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ করে ফেলা হয়েছে। এদের সংখ্যা মাত্র ৯২টি ও তার মধ্যে ৯১টি আবিষ্কৃত হয়ে গেছে, বাকি একটি আবিষ্কৃত হতে বোধ হয় বেশীদিন দেরি নেই, সেটি আবিষ্কৃত হয়ে গেলে আর নতুন কোন মৌলিকপদার্থ আবিষ্কারের কৃতিত্ব লাভ করবার অবশিষ্ট কিছু থাকবে না। ভাবতে বড় চমক লাগে যে জ্ঞানের একটা দিক এমন নিঃশেষিত ভাবে সম্পূর্ণতা পেতে পারে!

এ সব ছড়া atom এর গঠন সম্বন্ধে আরও অনেক গুরু ও লঘু প্রমাণ আছে—যথা বর্ণচ্ছত্রের বিশ্লেষণ, অণু ও পরমাণুর নানা আচরণ, নানা রকম প্রেক্ষণ (experiments) ইত্যাদি। এ সবের চেয়েও সার কথা এই যে অণু পরমাণুর গঠন-প্রকৃতি সিদ্ধ হয়েছে Qumtum theory, Election theory, Wave mechanics, Relativity প্রভৃতির সমবেত সংযোগীতায়। কিন্তু আশ্চর্য্য লাগে যে সডি এ সকলের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করতে ও এগুলিকে আজগুবি বলতে ছাড়েন নি। তিনি বইটির মুখবন্ধে লিখেছেন "The fundamental reconstruction of our outlook upon the world of matter, energy, space and time which is now being attempted mainly as the consequences of the Succeses of the theory of Relativity, seems to neglect the ordinary phenomena of nature in favour of the exceptional." আর এক জায়গায় লিখেছেন—nothing ought to be allowed to be assumed which is not directly amenable to observation." প্রত্যক্ষগোচর জিনিষকে তিনি তথ্য থেকে বহু উর্দ্ধে স্থাপন করেছেন কিন্তু প্রত্যক্ষগোচর হয় কতটুকু? তা' ছাড়া যেখানে তথ্য প্রত্যক্ষগোচর জিনিষকে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছে সেখানে তিনি তথ্যকে স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি কিন্তু সেই একই তথ্য যতটুকু নিজেকে পদার্থ-বিজ্ঞান ও গণিতের সূত্রের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে ততটুকুকে তিনি অস্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। In no other subject is there such a confusing set of phenomena or such a mass of numerical data of unsurpassed accuracy as in spectroscopy, and it is a veritable triumph that the assumptions necessary to account for them should also serve to explain the number of chemical elements!"—আবার "It is also, in this very field that the wave mechanics has achieved

its greatest triumph, so far, in the prediction of two different kinds of Hydrogen gas, which when looked for, were found"। নব্য বিজ্ঞানের পরিকল্পনাগুলিকে কেবল আজগুবি বলা নিতান্ত কাঁচা কাজ, কেননা দশটি আজগুবি পরিকল্পনা একত্র হয়েও কখন শত শত প্রত্যক্ষগোচর ব্যাপারকে হুবহু অঙ্কের হিসাবে মিলিয়ে দিতে পারে না, তা ছাড়া আবার যা কখনও পূর্ব্বে দেখা যায় নি এমন সব জিনিষ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। কিন্তু নব্য বিজ্ঞান তাই করেছে—হাইড্রোজেনের কথা সডি নিজেই বলেছেন তা' ছাড়া একটি দুটি নয় অনেকগুলি অদৃষ্টপূর্ব ও অজানিত মৌলিক পদার্থের খবর ও নব্যবিজ্ঞান এনে দিয়েছে যাদের পরে খুঁজে পাওয়া গেছে। মনে হয় সডি পদার্থ বিজ্ঞানে ও গণিতে বড় কাঁচা নতুবা তাঁর এরকম অশোভন অবৈজ্ঞানিকপণার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অতি অল্পদিন আগেই প্লাঙ্ক বলেছেন যে বিজ্ঞান তত্ত্বানুসন্ধানের একটা সঙ্কেত মাত্র, বিজ্ঞান সর্ব্বসংশয়হারী জ্ঞানের পরিসমাপ্তি নয়। বিজ্ঞানের লক্ষ্য সমাপ্তিতেই পৌছান কিন্তু লক্ষ্যে পৌছান এক কথা ও সেপথে অগ্রসর হওয়া আর এক কথা। বিজ্ঞান যদি সে লক্ষ্যে এত সহজেই পৌছাতে পারত তা হলে সডির মত বৈজ্ঞানিকদের দানাপানির সম্বল শেষ হত।

বইখানিতে অতি চমৎকার অনেকগুলি ছবি ও ফটো সংগ্রহীত হয়েছে।

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

The Odyssey of Homer,—Newly translated into English Prose by T. E. Shaw (Oxford).

হোমরের Odyssey-র যত অনুবাদ আমরা পড়িয়াছি তাহার মধ্যে ইহা, অনুবাদক স্বীকার না করিলেও সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ও চিত্তোদ্দীপক। মুখ্যতঃ না হইলেও গৌণতঃ প্রত্যেক অনুবাদই ব্যাখ্যা। Odyssey-র এই নূতন অনুবাদটাও একটা ব্যাখ্যা যাহার মধ্যে প্রাচীন সাহিত্যের এক টা বিশিষ্ট কীর্ত্তিকে আধুনিক চিন্তার মাপকাঠিতে বিচার করা হইয়াছে।

অনুবাদক T. E. Shaw-এর কুল ও শীলের কোন পরিচয়ই যদি আমাদিগের না থাকিত, তাহা হইলেও মুখবন্ধের মন্তব্যগুলি ও অনুবাদের বিশিষ্ট ভঙ্গী হইতে তাহার সম্বন্ধে এই কয়েকটা বিষয়ের ধারণা করা মোটেই শক্ত হইত না। প্রথমতঃ, T. E. Shaw একজন Anglo-saxon—ইংরাজ; দ্বিতীয়তঃ তিনি একজন খৃষ্টান, ও তৃতীয়তঃ তিনি একজন বিংশতি শতাব্দীর লোক।

ইংরাজ বলিয়া তিনি তাঁহার Beowulfকে ভুলিতে পারেন না ; আর সেই সঙ্গে সাগর ও সাগরিক বেষ্টনী হতে আপনাকে মুক্ত করতেও পারেন না। তাই যখন তিনি বলিলেন ; "He (Homer) had sailed upon and watched the sea with a palpitant concern, seafaring being not his trade" তখন তাঁহার কোন নূতন কথাই বলা হইল না। বলা হইল মাত্র সেই পুরানো কথা—গ্রীক সভ্যতা মূলতঃ—নাগরিক, এংলো স্যাক্সন্ (টিউটনিক বা স্ক্যান্‌ডিনেভিয়ান) সভ্যতার মত সাগরিক নহে, যে সভ্যতার সাহিত্যিক অভিব্যক্তির প্রথম অধ্যায়ে সাগরীয় আবেষ্টনীর ছাপ সুস্পষ্ট।

আবার যখন তিনি বলিলেন যে ধর্ম্মভ্রষ্ট নারীর (যথা হেলেনএর) প্রতি গ্রীক বীরগণের male condescensionএর সহিত ভৃত্যের প্রতি য়ুলিসিসের 'charity of head and heart' তুলনা করিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না, তখনও তিনি বড় একটা ভুল করিয়া বসিলেন। 'male condescension towards inglorious woman অর্থাৎ ভ্রষ্টা নারীর প্রতি পুরুষের অনুকম্পা মহাকাব্য যুগের একটী সাধারণ ধর্ম্ম—যে ধর্ম্ম বিংশতি শতাব্দীতেও একেবারে লোপ পায় নাই অর্থাৎ য়ুরোপে তাহা শতকরা পাঁচ ও ভারতবর্ষে শতকরা পঁচান্নবই হারে নৈতিক ও সামাজিক জীবনে এখনও বিদ্যমান। আর charity (অর্থাৎ বিশিষ্ট রং ও রূপযুক্ত প্রেম) একটী খাঁটি খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অর্থাৎ ইহা গ্রীক ধর্ম্ম নয়। গ্রীকচরিত্রের কোন অংশে ইহা আরোপ করা একেবারে—আগাগোড়া—ভুল। Bible ও Plato পাশাপাশি রাখিয়া আর একবার আমাদের অর্জ্জিত ভাবগুলিকে ঝালাইয়া লইলেই সম্যক উপলব্ধি হবে।

Shaw মহাশয়ের আর একটী অভিযোগ এই যে হোমরের অডিসি গল্পটার প্রত্যেক বড় ঘটনাই হোমরের হাতে পড়িয়া উপরে না উঠিয়া ফসকাইয়া নীচে পড়িয়া গিয়াছে। ইহার উদাহরণ shaw এর মতে অডিসির একাদশ সর্গ—নরকবর্ণনা। শুদ্ধ ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষাকে সজোরে ঝাঁঝাল করিতে গেলেই সে ভাষা প্রায়ই ঝাঁঝাল না হইয়া ধোঁয়াটে হইয়া পড়ে। Shaw মহাশয় কি এই আশা করিয়াছিলেন যে অডিসির একাদশ সর্গ Danteএর Infernoএর বিপুল গভীর epic আকার ধারণা করিবে ? সে আশা কিন্তু হোমরের অনেক পাঠকই করেন না।

Shaw মহাশয় লিখিয়াছেন 'Epic belongs to early man and this Homer lived too long after the heroic age to feel *assured* and *large* ; ইহাও নূতন তথ্য নহে। Merry, Munro প্রমুখ গ্রীকবিদ্ পণ্ডিতেরা বহু পূর্ব্বে ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। 'At any rate there can be doubt that the Iliad and Odyssey do not present themselves to us as first attempts in Epic poetry ; their finish and prefection point to the climax rather than to the commencement of art. This view is corroborated by the allusion in the Homeric poems to other bards such as Phenius in Othaca and Demodocus at the Phaeacian court' (Merry).

আমাদের বিশ্বাস যে হোমরেরও আত্ম-প্রত্যয় ছিল—ছিল না (এস্থলে Shaw ঠিকই বলিয়াছেন) তাহার বিপুলতা-বোধ। তুলনামূলক সাহিত্য বিচারের মানদণ্ডগুলির উপর নজর রাখিলে আমাদের মহাকাব্য সম্বন্ধে মামুলী অনেক ধারণা মন হইতে অনেকটা

ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। প্রত্যেক মহাকাব্যেই যে একটা বিরাট space sense (দেশ-বোধ) থাকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। তাই কুরুক্ষেত্রের বিপুলতা ইলিয়াডে মেলে না আর অডিসি-চিত্রের কোথাও Valhallaর স্থান নাই। কিন্তু এতাদৃশ দেশ-বোধ না থাকিলেও হোমরের মহাকাব্য মহান্ বলিতেই হইবে, কারণ মাত্র ব্যাপকতাই মহত্ব নয় যদিচ ব্যাপক হইয়াও মহাকাব্য মহান্ হইতে পারে (যথা মহাভারত, আইসল্যাণ্ডের saga ইত্যাদি)। বহু বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্য শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সহিত সমালোচকের একবার কয়েক মিনিটের জন্য সাক্ষাৎ হইয়াছিল ; তিনিও অনেকটা ঈদৃশ মন্তব্যের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছিলেন।

এত কবি থাকিতে Shaw মহাশয়ের হোমরের সহিত ভিক্টোরিয়া যুগের Morris-এর তুলনা করার সার্থকতা কি ? ইহা আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারি না। তবে মনে হয় এই কারণে। Morris ছিলেন ঘরের লোক ও প্রায় সমসাময়িক। হোমরের সংক্রমণ হইতে আপনাকে প্রাণপণ বাঁচাইতে গিয়া Shaw মহাশয়, ভিক্টোরিয়া যুগের বাস্তবতার মধ্যে যে কবি কিছুকালের জন্যও Earthly Paradise সৃষ্টি করিয়া লোকের মন ভুলাইতে পারিয়াছিলেন তাঁহার সংক্রমণের গণ্ডীর মধ্যে ধরা পড়িলেন। তাই তিনি বললেন—(Homer) had less poetry (than Morris) আর হোমরের ব্যঞ্জনার (style) সমস্ত আকর্ষণী শক্তিকে তিনি মাত্র মাধুর্য্যে নিঃশেষিত করিলেন।

Shaw মহাশয়ের মুখবন্ধে সাহিত্যের মূল্য নির্ণয়ার্থ নানা মানদণ্ডের যে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে তাহার মূলে আছে তাঁহার একটী ছোট অহমিকা। 'For years we were digging up a city of *roughly* the Odysseus period &c। Shaw-এর পূর্ব্বে জর্ম্মান পণ্ডিত Schliemann ও (১৮২২—১৮৯০) তাঁহার বহুবৎসরব্যাপী excavations'এর ফল Ilios (১৮৮১) ও Troja (১৮৮৪) গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ; আর পরবর্ত্তী গ্রীক্‌বিদ্ পণ্ডিতবর্গ সেই সকল archaeological আবিষ্কার সমূহের সহিত হোমর অঙ্কিত চিত্রের যোগাযোগ দেখাইয়াছেন। যতক্ষণ না Shaw মহাশয় টীকা ও টিপ্পনীর সাহায্যে তাঁহার আবিষ্কার সমূহের সহিত হোমরের চিত্রের গরমিল না দেখান ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুবাদটী মোটেই convincing হইবে না ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

উপরি-উক্ত অহমিকার ঝোঁকে shaw মহাশয় বলিলেন—(Homer was) "a lover of old bric-a-brac, though as muddled an antiquary as Walter Scott." এই উক্তিটিও কোনরূপে হোমরের পক্ষে অপবাদজনক নহে। প্রাচীন, মধ্যযুগীয় বা আধুনিক কোন জীবনই সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে না—ইহা aesthetic impossibility। হইতে পারে আংশিক ভাবে আর old bric-a-brac দিয়া—তবে সেটা হইবে imaginatively transfigured। আর antiquary হিসাবে Scott ও Homer'এ দোষ থাকলেও কেহই মাত্র উহার দরুণ ছোট নহেন।

Shaw বলেন—(Homer) "does make a hotch-potch of periods"। Roughly the Odysseus period বলিয়া Shaw মহাশয় নিজের চর্ম্ম বাঁচাইলেন ; কিন্তু অডিসির বেলায় তিনি গোড়াতেই ধরিয়া বসিলেন যে ইহা একটী "single, authentic, un-edited work of art"।

Shaw বলেন যে মূলতঃ অডিসির গল্পটাই তাঁকে আকৃষ্ট করিয়াছে—obviously the tale was the thing। আর পরিশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে "ধূর্ত্ত", "বিড়ালধর্ম্মী" Penelope, "আত্মাভিমানী" অডিসিউস, তাঁহার priggish পুত্র টেলিমেকাস্ ও master-prig মেনেলাউস্—অর্থাৎ অডিসি-কাহিনীর সকল মুখ্য চরিত্রের মধ্যে কোনটাই হোমরের নয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি—তাহারা যদি কেহই হোমর-কল্পিতও না হয় বা যুগানুভূতি-প্রসূতও না হয়, তাহা হইলে তাহারা আবির্ভূত হইল কোথা হইতে? মোট কথা এই—"কাহিনীটা হইবে সত্য আর তাহার মধ্যগত চরিত্র হইবে মিথ্যা"—Shawএর মনোগত ঈদৃশ ছবি হইতেছে একটা psychological impossibility। আর Shawএর ঐ চোখা চোখা বিশেষণগুলি!—সে বিষয়ে ঝগড়া ত হইতেই পারে—তবে সে ঝগড়া এখানে স্থানাভাবে উহ্য রহিল।

সমস্ত বইখানি নাড়িতে চাড়িতে ও তারই সঙ্গে ম্যাথ্যু আর্ণল্ড্-বিশ্লিষ্ট হোমরের diginity, majesty ইত্যাদি গুণাবলী একে একে ভুলিতে ভুলিতে, Shaw সম্বন্ধে আমাদের এই ধারণা হয় যে তিনি (যেন) কোন আধুনিক সংবাদপত্রের পক্ষ হইতে ঐ *Excavation Party*'র অনুগামী *Special Correspondent*। তাঁহার মুখবন্ধটী একটী ছোট সুন্দর *Write-up* আর তাঁর, অনুবাদ একটি উদাহরণ-পরিপূর্ণ বিবরণ—এ বিবরণটীতে *archaelogy*'র মধ্য দিয়া হোমর যুগের অনাদি সত্য পাইবার লোভে তৎসম্বন্ধে উপযোগী, কৃচ্ছ্রলভ্য, আর্ট হিসাবে শান্ত—চূড়ান্ত সত্যকে আধুনিকতার coordinates'এর অনুপাতে অতি উপাদেয় ভাবে বিকৃত করা হইয়াছে। যথা :—(ক) Only Odysseus tarried, shut up by *Lady* Calypso, a nymph and very Goddess in her hewn-out caves (পৃ—১)। এস্থলে Lady কথাটির প্রয়োগে Calypso প্রাচীন যুগ হইতে মধ্যযুগে অবতীর্ণা হইলেন। (খ)...... and the three merry bachelors are always wanting clothes newly washed when they go *out to dances* (পৃ—৮৬)। (গ) The mother packed tasty meats in a *travelling-box* ইত্যাদি (পৃ—৮৬)। [এ দুই স্থলে Nausicaa'র ভ্রাতৃগণ ও মাতাঠাকুরাণী প্রাচীন যুগ হইতে এক লাফে মধ্যযুগ পার হইয়া অবতীর্ণ হইলেন একেবারে বিংশতি শতাব্দীর ইংরাজ রাজধানী লণ্ডন সহরে]।

শ্রীগঙ্গাচরণ কর

ভারত ও ইন্দোচীন :—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী।

এক সময়ে আমাদের দেশে সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস ছিল যে হিন্দুর স্থান কেবল হিন্দুস্থানের মধ্যেই এবং তাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতা ভারতের চতুঃসীমার ভিতরে আবদ্ধ। স্মিথ্ সাহেবের বই পড়ে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ঐক্যসম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয় ছিলুম্। কিন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনে সমগ্র ভারতের কতদূর মিলন সাধিত হয়েছিল, সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মতদ্বৈধ থাকায় আমাদের ঔদাসীন্যের অবধি ছিলনা। আজকাল পুরাবৃত্ত অনুশীলনের

ফলে আমাদের সে ভ্রান্ত ধারণা ও ঔদাসীন্য দূর হয়েছে। দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণ অনেক নূতন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করে দেখিয়েছেন যে হিন্দুস্থানের বাইরে ভারতের অনেকগুলি উপনিবেশ ছিল, যাদের ভাবগত মিলন হেতু উপহিন্দুস্থান নামে অভিহিত করা যেতে পারে। কিছু কাল পূর্ব্বে এই বিস্মৃত যুগের যে, গৌরবময় অধ্যায়ের পাঠোদ্ধার হয়েছে, তার ফলে আমরা জেনেছি যে ভারতের অতীত একেবারে শূন্যগর্ভ ছিলনা। এটুকু স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যে বৌদ্ধদের যত্নে ও পরিশ্রমেই ভারতীয় সভ্যতার প্রসার সম্ভব হয়েছিল।

প্রবোধবাবু ইন্দোচীন ভ্রমণ করে এসেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার ফল এই বইখানি। এই পুস্তিকাটি কেবল ভ্রমণকাহিনী নয়, আবার একে ঠিক্ ঐতিহাসিক প্রবন্ধও বলা চলেনা। এখানি মূখ্যত বিদেশ প্রসঙ্গ, আর সেই প্রসঙ্গে কম্বোজ ও চম্পায় হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় গৌরব ও স্থপতি শিল্পের একটি সুন্দর পরিচয়। বইখানি নিশ্চয়ই পাঠকের মনে ভারতের বিচিত্র অতীত ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে কৌতূহল উদ্রেক করবে। যাঁরা পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু ছাত্র, তাঁদের জন্য "বৃহত্তর ভারতের" গ্রন্থাবলী রয়েছে। কিন্তু যাঁরা বিশেষজ্ঞ নন্ তাঁদের কাছে এই প্রাঞ্জল বইখানি সুখপাঠ্য হবে। প্রবোধ বাবুর ভাষার একটি বিশেষ গুণ আছে। সংযত হলেও তাতে বর্ণনার উজ্জ্বলতা আছে; বিষয়-বস্তুর স্বকীয় গৌরব সত্ত্বেও, লেখার নিজস্ব ভঙ্গী কোথাও ম্লান হয়নি। যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও সাহিত্যিক স্পর্শ থাক্‌লে ঐতিহাসিক কাহিনী লোভনীয় হয়, তার পরিচয় এই পুস্তকের অনেক স্থানেই মিলেছে।

প্রবোধবাবু দেখিয়েছেন যে মানুষের শ্রেষ্ঠদান হ'ল সভ্যতার আলোকদান। প্রাচীন কালে একদিন ভারত-সন্তানেরা যে কম্বোজ ও চম্পায় এসে সভ্যতা বিস্তার করেছিলেন, তা এখনও ঐ এঙ্কোর ভাট্ বায়ন-মন্দির ও শ্রীলিঙ্গরাজের মন্দিরে প্রস্তরের উপর হিন্দুদের অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্য দেখ্‌লেই বোঝা যায়। কিন্তু এই আধিপত্যের ভিতর কোনো বিসদৃশ সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ছিলনা; যা ছিল তা ভারতবর্ষীয় সভ্যতার উদারতা ও মহত্ত্ব। জ্ঞান ও সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত বলে ভারতের অন্তরের ও বাহিরের মিলন সার্থক হয়েছিল। এক চোলরাজ রাজেন্দ্র দেব ছাড়া কোনো হিন্দুরাজাই ক্ষণিক জয়লিপ্সার বশবর্ত্তী হয়ে এ অঞ্চলে পদার্পণ করেন্ নি। সুতরাং মনে দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক যে আনামী অথবা চীন-তিব্বতীয় আক্রমণে মহেন্দ্রবর্ম্মণ, সূর্য্যবর্ম্মণ প্রমুখ কীর্ত্তিমান্ রাজাদের গৌরবময় যুগ চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়ে গেছে! অথচ নিকটেই যবদ্বীপে ও বলীদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম ও সভ্যতা সম্পূর্ণ বিদেশীয় সংস্পর্শে এসেও এখনও টিঁকে রয়েছে এবং স্থানীয় হিন্দুরা সযত্নে তাদের স্বধর্ম্ম ও স্বরাজ্য রক্ষা করে চলেছে। চম্পার হিন্দুদের বংশধর যে এখনও বর্ত্তমান, তার একমাত্র নিদর্শন ক্ষীয়মান, মুষ্টিমেয় "চ্যাম" জনসংখ্যা। যে বিরাট্ সভ্যতা ত্রয়োদশ শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছিল, তার এই আকস্মিক বিলোপের কারণ আর যাই হোক্ ভারতবাসী ও অধিবাসীদের মধ্যে কৃত্রিম সংযোগ অথবা প্রাণহীন ঐক্য বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। সে যাই হোক্, ইন্দোচীনের মন্দির-গুলি যে এখনও ভারতের সমৃদ্ধ যুগের সাক্ষ্য দিচ্ছে, তার জন্য ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই ফরাসীদের নিকট কৃতজ্ঞ ও ঋণী। প্রবোধবাবু ফরাসী ঐতিহাসিকদের কর্ম্মনিষ্ঠা ও সশ্রদ্ধ মনোভাব লক্ষ্য করেছেন। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। সুদূর হ্যানয়ের প্রাচ্য বিদ্যাপীঠে যে একদল নিঃস্বার্থ ঐতিহাসিক গভীর অধ্যবসায়ের সহিত কাজ করে

যাচ্ছেন, তাঁদের প্রেরণার উৎসমূলে আছে ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাসূচক দৃষ্টি, আর সে দৃষ্টি কার্জ্জনী কৃপাকটাক্ষ নয়। সুতরাং ফরাসী মনীষী ভ্যালেরি ইতিহাসের অনুশীলন যতই বিপত্তিসূচক বলুন্ না কেন, এক্ষেত্রে সে চর্চ্চায় ফরাসীদের বুর্জ্জোয়া মনোভাব অথবা শাসনতন্ত্রের মর্য্যাদা কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা নেই। বরং তাঁদের রাষ্ট্রীয় অধিকার যে অটুট আছে তার নমুনা প্রবোধবাবুর বইতে কিছু কিছু মেলে।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

"The Great Offensive"—by Maurice Hindus—Gollancz.

মরিস হিণ্ডাস আমেরিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ জার্নালিষ্ট হলেও রাশিয়ার কোন ক্ষুদ্র গ্রামে কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন এবং স্বদেশের মাটি ও ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবার পর বিদেশ-যাত্রা করেন। বিপ্লবের পর ১৯২৩ সালে তিনি প্রথম রাশিয়াতে ফেরেন এবং তারপর প্রায় প্রতিবৎসরই মাতৃভূমির সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন; সঙ্গে দোভাষী নেবার প্রয়োজন হয়নি। নামের ডঙ্কা তাঁর অগ্রগামী হয়নি, সুতরাং সোভিয়েট প্রচার বিভাগের আতিথেয়তা হতে রক্ষা পেয়েছিলেন। স্বনামধন্য দার্শনিক Dewey 'Humanity Uprooted' বইটির মুখপত্রে বলেছেন—'প্রতিক্রিয়া প্রবণ মানবমনের এমনই স্বভাব যে, যে কোন সামাজিক-সমস্যার পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত হলে প্রাপ্ত-বিদ্যা, সংস্কার ও রুচি সেই সঙ্গে অপরিহার্য্যের মত এসে পড়ে। হিণ্ডাসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি বিপ্লবজনিত ঘাত-প্রতিঘাতে মানবহৃদয়ের সঙ্কোচন ও প্রসারণ গভীর অনুকম্পার সহিত অনুভব করলেও, শিল্পীর মত নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন। আমার মনে হয় হিণ্ডাসের এই নিরপেক্ষতার মূলে আছে শিল্পসাধনার গভীরতা। সেইজন্য রচনাগুলি সাংবাদিক সাহিত্যচাতুর্য্যের পর্য্যায়ভুক্ত না হয়ে লালিত্যে ও ভাবের ঘনত্বে এত মর্ম্মস্পর্শী হয়েছে।

যখন প্রাচ্যদিগন্ত বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধসাহিত্যে সমাকুল—সংবাদপত্রের সৌজন্যে সুধীবৃন্দ বলশেভিক নীতি-শৈথিল্যের এক বিকট চিত্রে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন—সেই সময় মরিস হিণ্ডাস অনাড়ম্বরভাবে বাস্তব চিত্রটি উন্মোচন করেন। Red Bread বইখানির আদ্যোপান্ত বিপ্লবক্ষুব্ধ মানবহৃদয়ের জ্বালাময় কাহিনী। মাটি হতে উৎক্ষিপ্ত কৃষাণের বুকভাঙ্গা রোদন, সৃষ্টির দ্যোতনা ও নবীনের মুক্তির আনন্দের মিলিত ব্যঞ্জনা পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় স্ফুট হয়ে অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ করেছে। বিপরীতমুখী ঝটিকাবর্ত্তের অন্তঃস্থলে রাশিয়ার যে সনাতন স্বরূপটি অবিধ্বস্ত রয়ে গেছে তার ক্ষীণ পরিস্পন্দ কোন বিদেশীর মর্ম্মস্থানে ছন্দিত হত না নিশ্চয়, অথচ এমন রাশিয়ান বিরল যে হয় বিপ্লব-পীড়িত বা বিপ্লব-চালিত নয়।

আলোচ্য বইটি পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পের পর্য্যালোচনা—অপেক্ষাকৃত ব্যাপকচিত্র, সঙ্কল্পের অবসানে রচিত। এতে নেই ছোট ছোট মানবজীবনের বিক্ষিপ্ত ইতিহাস, আছে বিরাট অভিযানের সর্ব্বাঙ্গীণ চিত্র। সঙ্কল্প গ্রহণকালে বিদ্যমান ব্যক্তিত্ব ও শ্রেণীবৈশিষ্ট্যের অবসন্ন কঙ্কাল যাত্রাপথে ধূলি গ্রহণ করে আর ওঠেনি। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় পাঁচ

বৎসর—সে ত পলকমাত্র। কিন্তু এই পলকের মধ্যে কত যুগ যুগান্তরের কাল-প্রবাহ সংহত হয়ে সেই চাপে কত অতীতকালের সঞ্চিত পাপ পুণ্যের ভাণ্ডার নিষ্পেষিত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। হিণ্ডাস এই সন্ধিক্ষণকে বিপ্লব হতে অধিকতর স্মরণীয় মনে করেন। নবীনের সহিত প্রাচীন মানবের যে অন্তিম সংগ্রাম হয়ে গেল তার ফলাফলের অন্তরালে ধ্বংসের ইঙ্গিত তার বিস্ময়মুগ্ধ উচ্ছ্বাসের তলে তলে তিক্ততার সমাবেশ করেছে। কিন্তু ফলাফলের অঙ্কপাতই বইটির অলঙ্কার—ভাষার লালিত্যে সে অলঙ্কার সাহিত্যসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটায়নি শিল্পপ্রতিভার গুণে।

১৯২৮ সাল বলশেভিকদের দারুণ দুরবস্থার সময়। কৃষাণদের অসন্তোষে গগন বিদীর্ণ। ইংরাজ রাজনৈতিক সম্বন্ধচ্ছেদ করেছে। আমেরিকা উদাসীন, ফ্রান্স ও পোলাণ্ড খড়্গহস্ত, জার্ম্মানী ও তুর্কী দুর্ব্বল, ইতালীর সহানুভূতি সীমাবদ্ধ। বাহির দ্বারে শত্রু—ঘরে অন্তর্দ্বন্দ্বের তাড়নে জীবনীশক্তি মুহ্যমান। এমন দিনে ট্রট্স্কীর সহিত ষ্টালিনের মতভেদ বেধে গেল। ট্রট্স্কী বিদায়কালে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেলেন যে সব অনুচরবর্গ তাদের মধ্যে অনেকে সোভিশেট রাষ্ট্রের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ষ্টালিন ও অবশিষ্ট নেতৃবর্গ দায়িত্বভার গ্রহণ করে দেখলেন তাঁদের নূতন সমাজের কণ্ঠনালীকে শত্রুর মুষ্টিমুক্ত করতে হলে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চবার্ষিক দুঃসাধ্য সাধনের মন্ত্র সেই সময় গৃহীত হয়। কিন্তু কেবলমাত্র যৌবনের উচ্ছ্বসিত প্রাণশক্তি ও ভূগর্ভস্থ জড় পদার্থের সহযোগে যন্ত্র উৎপাদনক্ষম হয় না। চাই দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, নিপুণতা যা শতাধিক বর্ষের ক্রম-বিবর্ত্তনেই সম্ভব।

যন্ত্রভীরু টলষ্টয়ের প্রচারচেষ্টায় ও পূর্ব্বতন-শাসকগণের আলস্যজড়িত বিবর্ত্তন-ভীরুতায়, রাশিয়ার ত্রিসীমার মধ্যে ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রেভোলিউশনের প্রভাব প্রবেশ করতে পারে নি। য়ুরোপীয় সুধীবৃন্দ সোভিয়েটের অসম্ভব সঙ্কল্পের বাতুলতায় বিজ্ঞের হাসি হেসে বলেছিলেন "বাগ্মিতার সম্মোহনে যদি বা মানবহৃদয়ে প্রলয় সৃষ্টি সম্ভব, হৃদয়হীন খনিজদ্রব্যকে যন্ত্রপাতিতে পরিণত করতে হলে চাই আলাদীনের প্রদীপ।"

অতীতের জগদ্দল পাথর ঠেলে ফেলতে পারলে ক্ষুদ্র মানব-শক্তি যে কতখানি মূর্ত্ত হয়ে উঠতে পারে, তা আমাদের কল্পনার অতীত, কারণ সে জগতে সময়ের আপেক্ষিক পরিমণ্ডল ভিন্ন।

হিণ্ডাস ১৯৩৩ সালের যে রুষচিত্র এঁকেছেন আলোচ্য বইটিতে—আপাত-দৃষ্টিতে দেখলে সত্যই মনে হয় আলাদীনের প্রদীপের কথা। পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্প চার বৎসর তিনমাসে পূরণ করা হয়েছে। গলদের তালিকা হয়তো বড় হবে। একটি প্রধান গলদ—দেশে আজ অবধি খাদ্যাভাব দূর হয়নি। কিন্তু কল কব্জা, যন্ত্রপাতি, অটোমোবিল, এরোপ্লেন অস্ত্র-সম্ভার ইত্যাদির নির্ম্মাণে আজ রাশিয়া যে সম্পূর্ণ আত্ম-নির্ভরশীল হতে পেরেছে এ কম কথা নয়। বৃহৎ যন্ত্র ও খনিজদ্রব্যের উৎপাদনে এই কৃষি-প্রধান অলস জাতি আজ জগতে শ্রেষ্ঠ ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিষ্ট আমেরিকাকে প্রায় ধরে ফেলেছে। চার বৎসরের গতিতে অনেক বিষয়ে ইংলণ্ড ও জার্ম্মানীকে পিছনে ফেলেছে। তুলনা-মূলক অঙ্কপাতে সঙ্কল্পের প্রকৃত সংজ্ঞা নিরূপিত হবার নয় বলে হিণ্ডাসের বই হতে প্রমাণ উদ্ধৃত করে দেবার লোভ সম্বরণ করলাম। আমাদের গভীরভাবে প্রণিধান করা উচিত—সঙ্কল্পের অগ্নিদীক্ষায় পূত ও পরিশুদ্ধ যে নবীন মানবের অভ্যুত্থান হয়েছে তার অন্তর্নিহিত সত্তাটুকু। অগ্নিদীক্ষা কথাটি আতিশয্যোক্তির মত অনেকের কানে বাজতে পারে। তাঁদের স্মরণ

করিয়ে দিতে চাই—যে বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীর দল যখন কর্ম্মপ্রেরণার উন্মাদনায় গা ভাসিয়ে ছিল উৎসবের আনন্দ ছিল তাদের একমাত্র পাথেয়। ভীষণ বিভীষিকাময় যাত্রাপথে তাদের পাথেয় ফুরিয়ে গিয়ে কলকারখানার অগ্নিপিণ্ড, ইস্পাতের নির্ম্মম কঠিনতা, হিমাদ্রীর মত কঠিন অভ্রভেদী ক্লেশ, চাষীর বুকভাঙ্গা ক্রন্দন হৃদয়ের কোমল প্রতিক্রিয়া প্রবণ তারগুলিকে একে একে ছিন্ন করেছে। স্ত্রী পুরুষ স্বেচ্ছায় প্রিয়সংসর্গকে দ্বিধা বিভক্ত করে স্বার্থের অন্তিম আকর্ষণ হতে সঙ্কল্পের মন্ত্রটি জাগিয়ে রেখেছে।

বিপ্লবের প্রবল ঝটিকার আবর্ত্তে যে শৈথিল্যের উন্মাদনা নবীন মনে উচ্ছৃঙ্খলতা এনেছিল সে ক্ষণটিকে রোমানভ অমর করে রেখেছেন তাঁর অতুলনীয় ছোট গল্প Without Flowersএ। আজ নূতন সমাজের নবতর আদর্শবাদ ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের অন্তরালে সে ক্ষণটি লীন হয়েছে। জগতের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় বিশ্ববিদ্যালয় যথেচ্ছাচারিতার প্রশস্ত ক্ষেত্র। রাশিয়ার ছাত্র-ছাত্রীর অবাধ মেলামেশায় কোন অন্তরায় নেই। শয়ন-কক্ষ ভিন্ন হলেও যাতায়াতের পথে প্রহরী মোতায়েন নেই, লোক-লজ্জার বালাই নেই—অথচ সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নৈতিক শৃঙ্খলার যে মাধুর্য্য ও শালীনতা পাই, তা আর কোথাও দেখা যায় না। হিণ্ডাস্ কারণ অনুসন্ধান করেন নি—কেননা তাঁর পুস্তকে অপ্রামাণ্য অনুমানের বাড়াবাড়ি নেই। তবে তাঁরই বর্ণিত আর একটি চিত্র হতে কিছু উদ্ধৃত করে দেখালে আশা করি নবীন রাশিয়ার নৈতিক আদর্শের মূলে অনেকখানি আলোকপাত করতে পারবো।

কোন বিখ্যাত মার্কিন মহিলা হিণ্ডাসকে বলেন তিনি রাশিয়াতে গেলে কখনই সন্তানের জন্মদান করবেন না কারণ সন্তানকে যখন হারাতেই হবে তখন মায়া বাড়িয়ে লাভ কি? এ মনোভাব বোধ করি বিশ্বজনীন। কিন্তু হিণ্ডাস রুষ ছাত্রীদের এই প্রশ্ন করে অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হোক বা না হোক তারা সকলেই জননী হতে চায়। সন্তান-কামনা-শূন্য মিলন তাদের ধারণায় বিলাসিতার ন্যায় পরিহার্য্য। ষ্টেট সন্তানকে গ্রাস করবে এ আপত্তি তাদের মনে উদিত হয় না, কারণ দেশাত্মবোধের গৌরবেই সন্তানকামনার উৎপত্তি। মাতৃত্বের এই গৌরব নবীন রাশিয়ায় শ্লীলতার ও শিষ্টতার মূল পরিবর্ত্তন করেছে, শাসনভীতির পরিবর্ত্তে দায়িত্ববোধ লোকচিত্ত অধিকার করেছে। সহরে যুবতীদের মধ্যে নারী সুলভ ছলা কলা ও অঙ্গরাগ প্রসাধনের অভাব দেখে বহু বিদেশী পর্য্যটক হিণ্ডাসকে প্রশ্ন করেছেন রুষ রমণীর নারীত্ব অপরিস্ফুট কিনা। যৌন সম্পর্কিত ব্যাপারে নীরব অনাড়ম্বর প্রশান্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার চক্ষে অলীক বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক বলে হিণ্ডাস বিপ্লবপ্রসূত এই বিস্ময়-চিত্রটিকে উজ্জ্বলতর করে এঁকেছেন। তিনি বলেন নবীন রাশিয়াতে সৌষ্ঠবজ্ঞান ও সৌন্দর্য্যবোধের সাড়া পড়ে গেছে নূতন সমাজের মানুষকে অতিমানুষ করে তোলবার আগ্রহে। নগ্নদেহের সঙ্কোচ সম্পত্তিজ্ঞানের সহিত লোকচিত্ত হতে মুছে গেছে। গ্রীষ্মের দিনে নদীতটে যে অগণন নরনারীকে অর্দ্ধ বা সম্পূর্ণ অনাবৃত দেহে বিচরণ করতে দেখা যায় তার মূলে নিয়ম ভঙ্গের বাহ্যাড়ম্বর নেই—আছে বিরাট সহজতা।

একত্রিত কৃষিপদ্ধতির অনুষ্ঠান পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পের প্রধান অঙ্গ ছিল। এক সময় পদ্ধতির সাফল্যের উপর বিপ্লবের মরণ বাঁচন নির্ভর করেছিল। ১৯২৩ সালে যেখানে চাষীরা Kolozএর নাম গল্পেও শোনেনি আজ সেখানে পাঁচ ভাগের চার ভাগ জমি একত্রিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট চাষীদের ও কারিকরদের সম্প্রতি ক্রয় বিক্রয়ের

অধিকার দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ী আজ সম্পূর্ণ নির্ম্মূল। শতকরা বিশজন স্বতন্ত্র চাষীর উপস্থিতিতে ভবিষ্যতে বিপ্লবের কোন অকল্যাণ আশঙ্কা করা যায় না। পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়েছে এই যথেষ্ট। কিন্তু এই দুঃসাধ্য-সাধনে নবীন কর্ম্মীর মর্ম্মস্থল যে দুর্ব্বহ আত্মবিশ্লেষণে যে অসহ নৈরাশ্যে যে দারুণ বেদনায় পীড়িত হয়েছে, তার বর্ণনাই হিণ্ডাসের পুস্তকখানিকে অমর করে রাখবে। রুষ চাষীর মত আদিম অপরিবর্ত্তিত মানুষকে মাটি হতে সমূলে উৎপাটিত করে নূতন অনভ্যস্ত পরিমণ্ডলে অসহায়ের মত গ্রথিত করে দিলে, তার যুগ যুগ সঞ্চিত বংশানুক্রমে আহৃত সম্পত্তি, সংস্কার ও ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে আঘাত করলে, সে বাক্সর্ব্বস্ব নিরীহ প্রাণী যে বিলাপের আতিশয্যে গগন বিদীর্ণ করবে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু শুধু চক্ষের জল ফেলেই সে মাটির কামড় ছাড়েনি—আপন প্রথামত নিষ্ঠুর ভাবে প্রতিঘাত করেছে—বালক কর্ম্মীকে দগ্ধে মেরেছে, মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছে, গৃহপালিত পশু নির্দ্দয়ের মত জবাই করেছে, প্রতি পথে বাধার সৃষ্টি করেছে—অবশেষে অবসন্ন হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে যখন তাদের নিজেদের নবীনেরা বিপ্লবের অলৌকিক স্পর্শে পর হয়ে দেবতা ও ভূতে বিশ্বাস হারানোর সঙ্গে সঙ্গে গুরুভক্তি ত্যাগ করেছে।

স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ববাদের ধ্বংসের পর শিশু-চিত্তের অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটেছে। পিতামাতা বিপ্লবের পরিপন্থী হলে সে গৃহ ত্যাগ করতে কিংবা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রদান করতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। নবীনের উপর আজ রাশিয়াতে যেরূপ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য অর্পিত হয়েছে বোধ করি মানব ইতিহাসে পূর্ব্বে কখনও হয় নাই।

বিপ্লবের তিনটি মহৎ কীর্ত্তি জগৎকে অবিসংবাদিতরূপে বিস্ময়মুগ্ধ করেছে; এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সমানভাবে অসভ্যের পর্য্যায়ভুক্ত করে দিয়েছে। তার একটি হচ্ছে কারাগার ও দণ্ডবিধির আমূল পরিবর্ত্তন, আর একটি গণিকাবৃত্তির উচ্ছেদ ও তৃতীয়টি সামরিক পদমর্য্যাদা-বৈষম্যের নিরাকরণ। হিণ্ডাস তাঁহার সুললিত ভাষায় তিনটি বিভিন্ন অধ্যায় অলঙ্কৃত করেছেন সোভিয়েট পরীক্ষার এই তিনটি সাফল্যচিত্র অঙ্কনে। চিত্র ত্রয় আমাকে মুগ্ধ করেছে কিন্তু সমালোচনাটি দীর্ঘ হয়ে পড়ছে বলে সংক্ষিপ্তসার দিতে নিবৃত্ত হলাম।

বিপ্লবের পূর্ব্বে জগতের সাহিত্য-আকাশ রুষ-শিল্পীর সৃজন-প্রতিভায় প্রতিভাত হয়েছিল অপূর্ব্ব বিভাসে। সে সময় শিল্পীর সৃষ্টিশক্তি নিত্য নিয়ত উদ্বুদ্ধ করেছে ধর্ম্মের প্রেরণা। ঘটনাগ্রন্থন ও চরিত্র-চিত্রন হয়েছিল পুরাতন সামাজিক পরিবেষ্টনের মধ্যে। ধর্ম্ম ও ব্যক্তিত্ববাদের উপক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-রচনার ধারা রূপকারের বৃত্তিকে উপেক্ষা করে বেষ্টনীর মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হয়ে মহামানবীয় সত্তাটুকু হারিয়ে বসে। ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত সৃজনের প্রেরণা নিরুদ্ধ হয়—ঘরোয়া যুদ্ধ বিগ্রহ ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানবের অভিজ্ঞতা-লব্ধ উপলব্ধির স্বল্প-পরিসর পরিধির মধ্যে। ক্রমে বিপ্লব-বিরোধী ঐক্যবাদিদের পৌর্ব্বাপর্য্য বিপর্য্যয়ের ব্যঙ্গ চিত্র সাহিত্যিকের সৃষ্টিশক্তি অধিকার করে বসলো। কবির উদ্ভাবনা শক্তি নবতর সমস্যার বঙ্কিমপ্রবাহ হতে কোন পরম উপলব্ধিই সংগ্রহ করতে পারল না। এমন দুরবস্থার দিনে নৈতিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতার তরঙ্গ এসে নবীন বেলায় দোলন লাগিয়ে দিল। রোমানভের অতুলনীয় ছোট গল্প Without Flowers সেই ক্ষীণটিকে অবলম্বন করে সৃষ্টি হল। The Embezzlers,

Moon on the Right, Dog Lane, Squaring the Circle, Three Pairs of Stocking, The New Table of Commandments সেই সময়ই রচিত। তারপর যখন পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পের ঝটিকা এসে দেশব্যাপী রাষ্ট্র-গঠনের আলোড়ন জাগিয়ে দিল তখন শিল্পীর স্বাধীনতা সম্পূর্ণ লুপ্ত হল। Rapp অর্থাৎ Proletarian Writers Society শিল্পীর দ্বারে প্রহরী হয়ে বসলো। Volozhin তাঁর একটিও রচনা ছাপাতে সাহস পেলেন না। Alexei Tolstoi সাহিত্য ছেড়ে ইতিহাসে মনোনিয়োগ করলেন। Babelএর ছোট গল্পের প্রতিভা স্তম্ভিত হয়ে গেল। Naked Yearএর লেখক Pylnyak প্রচার-মূলক গ্রন্থ রচনায় আত্মসমর্পণ করিলেন—কিন্তু বলশেভিক আত্ম-সমালোচন-রীতি কোন রুচি অরুচি নৈতিকপদ্ধতি বা রাষ্ট্রিক-বিধি ব্যবস্থার অবিসংবাদিত্ব গ্রাহ্য করে না—Rappএর বিরুদ্ধে লোকমত প্রবল হয়ে উঠতে ১৯৩২ সালে এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠানটিকে বন্ধ করে শিল্পীর শৃঙ্খলমোচন করা হল। বিপ্লববিরুদ্ধ শিল্পরচনার পথে প্রহরী মোতায়েন রইল বটে—হিণ্ডাস তবু বলেন গত বৎসর গ্রীষ্মের সময় তিনি যখন রাশিয়াতে গমন করেন শিল্পীর বাধামুক্ত উচ্ছ্বাসের আতিশয্য তাঁকে বিস্মিত করে। শিল্পী আজ সেখানে ইঞ্জিনিয়ারের সমতুল্য আদর পাচ্ছেন। অশন ব্যসনের জন্য তাকে চিন্তিত হতে হয় না কারণ রাশিয়াতে শিল্প চাহিদার বিরতি নেই। শিক্ষার বিস্তৃতিই বোধ করি এ চাহিদার কারণ—১৯১৭ সালে যে দেশ অজ্ঞতায় মুহ্যমান ছিল, ১৯২০ সালে সেথায় শতকরা ৩২ জন শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়—আজ পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পের অবসানে সারা রাশিয়া অনুসন্ধান করলে শতকরা মাত্র ৯ জন নিরক্ষরের সাক্ষাৎ মিলবে।

অনেকে মনে করেন রাশিয়াতে নিরীশ্বরবাদীদের সাফল্য কতকটা বাহ্যিক। আসলে বলশেভিকবাদ ধর্ম্মের নামান্তর হয়ে মানবহৃদয়ের চিরন্তন পূজাপ্রবৃত্তিটিকে দখল করে বসেছে। পূর্ব্বতন ধর্ম্মানুষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ পৌরোহিত্য-প্রথা ইত্যাদি বিশ্বাস নাকি ভেক্ বদল করে যেমন তেমনি বিদ্যমান আছে। এই মতবাদটি সম্পূর্ণ অমূলক নয়—কারণ বলশেভিকদের উৎসবামোদের ব্যবস্থা, আত্মশোধন ইত্যাদি কতকগুলি রীতির সহিত গির্জ্জা-পদ্ধতির কিছু কিছু মিল দেখতে পাওয়া যায়। লোকচিত্তে মার্কস-ইজম ও লেলিন্-ইজম fundamentalismএর মত দৃঢ়ভাবে আসন গ্রহণ করেছে মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—গোঁড়া খৃষ্টানদের মধ্যে তর্ক উঠলে যেমন পরস্পর, পুঁথির দোহাই পাড়তে থাকে তেমনি ষ্টালিন ও ট্রট্স্কীর বাক্‌যুদ্ধ যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন উভয়ে পরস্পরের প্রতি লেলিন্ ও মার্ক্স মার্কা বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন।

হিণ্ডাস এই প্রচলিত মতবাদটিকে খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত বলশেভিকবাদের মূলগত ঐক্য নেই—তার প্রমাণ—প্রথমতঃ বলশেভিকরা প্রার্থনা করে না, ঊর্দ্ধলোকের সহিত কোন আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ রাখেনি, তাদের নীতিতে বিপ্লব-বিরুদ্ধাচারীর ক্ষমা নেই। দ্বিতীয়তঃ মার্কস-নীতির মূল তত্ত্বই হচ্ছে প্রগতির নিরুদ্দিষ্ট চক্রামণ, যেমন প্রবহমান নদীর জোয়ার, ভাঁটা, দোলন আছে—নেই স্থিতি। তারা সাম্যবাদকেও মানব-সমাজের চরম উপলব্ধি মানে না—বলে পন্থা।

বলশেভিকবাদের জগদ্ব্যাপী বিপ্লব আনয়নের মোহ কেটেছে বলে মনে হয়। ষ্টালিন সোভিয়েট রাষ্ট্রকে চালনা করেছেন সার্ব্বভৌমিক শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হতে

বিপরীত মুখে। শ্রেণীবিরোধের দ্বারা জগতের সর্ব্বত্র বিপ্লব আনয়ন সম্ভব কিনা এ সমস্যা :আজও তর্কাধীন তবে হিণ্ডাস ট্রট্স্কীর সহিত একমত হয়ে বলেছেন যে দেশে মধ্যসত্বোপভোগী শ্রেণী প্রবল সেখানে বিরোধের দ্বারা শ্রমিকের উত্থান সম্ভবপর নয়। শ্রেণীবৈষম্য নিরাকরণের আর কি উপায় আছে হিণ্ডাস সে কথা বলেন নি।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

Acharya Ray Commomaretion Volume—
Edited by Hirendranath Dutt, Meghnad Saha Satyacharan Law and others. Published by N. C. Paul, Calcutta Oriental Press, 9 Panchanan Ghosh Lane, Calcutta.

সপ্ততিতম বৎসর উপনীত হওয়ায় আচার্য্য রায়ের প্রাক্তন ছাত্রমণ্ডলীর পক্ষ থেকে এই জয়ন্তী-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। এই ঋষিতুল্য ব্রহ্মচারী, পরহিতসর্ব্বস্ব অধ্যাপকের সম্যক্ সম্বর্দ্ধনা করতে পারায় বাংলাদেশের গৌরববৃদ্ধি হল। এই সম্বর্দ্ধনায় যেমন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও দেশের অন্যান্য গণ্যমান্য লোক যোগ দিয়েছেন তেমনি বিদেশের বহু মনীষী যোগদান করে গ্রন্থটিকে মর্য্যাদাবান করেছেন। মহাত্মাজীও আচার্য্যদেবের প্রশস্তি করেছেন।—গ্রন্থটি প্রধানতঃ প্রবন্ধাদিতে পূর্ণ, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই বেশী কিন্তু এগুলি অধিকাংশ স্থলেই সাধারণোপযোগী করে লেখা। এ ছাড়া নানা বিষয়ে নানারূপ প্রবন্ধাদি সংগৃহীত হওয়ায় গ্রন্থটি বড়ই উপভোগ্য হয়েছে। গ্রন্থটির কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর, ছাপা অপেক্ষাকৃত খারাপ, যা' হোক এই গ্রন্থ সঙ্কলনের মত একটি দুরূহ কাজ সুসম্পাদিত করার জন্য সম্পাদকমণ্ডলী বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

প্রবন্ধগুলীর সম্যক্ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। যেগুলি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কেবল সেইগুলিই আমি উল্লেখ করব। বাংলা প্রবন্ধের মধ্যে অধ্যাপক নিখিল সেনের রচিত "ব্রহ্মাণ্ডের আকার" সকলের চেয়ে উল্লেখ-যোগ্য। অধ্যাপক সেন Expanding Universe সম্বন্ধে সারগর্ভ মৌলিক গবেষণা করেছেন; বাংলায় লেখা তাঁর এই মনোরম প্রবন্ধ সাধারণের কাছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই আধুনিক সমস্যার পরিচয় উপস্থিত করবে। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের "বাঙ্গালী জাতি আত্মপ্রতিষ্ঠা" প্রবন্ধে তাঁর অননুকরণীয় বাংলা লেখার ভঙ্গীতে আধুনিক কালোপযোগী রাষ্ট্রনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন যে—বাঙ্গালীজাতি বিশ্বের রাষ্ট্রমণ্ডলে একটি মজবুত ও কর্ম্মঠ রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারে। কথাটা অন্ততঃ মুখরোচক লাগে। ডক্টর সত্যচরণ লাহার "ঋতুসংহারে দুইটি পাখী" প্রবন্ধে ক্রৌঞ্চ ও কারণ্ডব সম্বন্ধে আলোচনা অতি সুখপাঠ্য। "বাংলার পল্লীগীতি" প্রবন্ধে খগেন্দ্রবাবু বাংলার এই লুপ্তমান গীতিছন্দোময় জীবনবিকাশের অন্তর্ধান নিয়ে বিলাপ করে পাঠককে বড় নিরাশ করেছেন, কেননা পাঠক অধ্যাপক খগেন্দ্রবাবুর মত লেখকের নিকট থেকে অন্ততঃ এই বিষয়ে একটা চলনসই বিবরণ শোনবার প্রত্যাশা করে কিন্তু তা না লিখে তিনি শুধু বিলাপ করেছেন

যে সে সারিগান, সে বাউল আর নেই! ইংরাজী প্রবন্ধের মধ্যে ভাষাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক স্নীতিবাবুর লেখা তানসেনের কবি প্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা প্রথমেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানেও সাধারণ শ্রেণীর উচ্ছ্বাস হয়েছে মুখ্য, আর সুদৃঢ় যুক্তি ও বিশ্লেষণ যা পাঠকের বুদ্ধি-বিচারকে প্রবুদ্ধ করবে ও যা আমরা স্নীতির বাবুর মত প্রতিষ্ঠাবান অধ্যাপকের কাছে আশা করতে পারি, তা হয়েছে গৌণ। প্রবন্ধে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় হল দুটি; ১ম—তানসেন একজন উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন ও ২য়,—ধ্রুপদ style হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আদি ও মূল style, মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্ব থেকেই তা প্রচলিত। তানসেন যে কবি ছিলেন সে কোন ধরণের কবি? গীতিকারদের কবি আখ্যা দেওয়া কিছুদিন পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল বটে, সে হিসাবে শুধু তানসেন কেন সকল ভাল গীতিকারই ভাল কবি। কিন্তু কবিতা ও কবি শব্দ এখন কি আমরা ঐ অর্থে ব্যবহার করি? তানসেন যে কতবড় Composer ছিলেন সে কথা আর নূতন করে প্রমাণ করবার প্রয়োজন নেই কিন্তু তিনি যে একজন বড় কবি এ কথা প্রতিপন্ন করতে গেলে নিষ্ফল প্রয়াস হবে। অপরদিকে আমরা এই কথাই বলে আসছি যে যতদূর জানা যায় তাতে ধ্রুপদ ষ্টাইল যে পঞ্চদশ শতকের পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল তার কোন নিদর্শন নেই। যদি অধ্যাপক মহাশয় বলেন যে প্রাচীন ধ্রুব-পদ ও ধ্রুপদ একই বা যদি তিনি বলতে চান যে ধারাবাহিকতার নিয়ম মেনে নিয়ে সিদ্ধান্ত করতে হবে যে ধ্রুপদ পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে, মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে, বা আর্য্যসভ্যতার গোড়া পত্তন থেকেই ছিল, তবে আমরা বলব যে এ সিদ্ধান্ত অনুমান-সিদ্ধ হতে পারে কিন্তু প্রমাণসিদ্ধ নয়। তিনি বলেছেন কাদম্বরীর মহাশ্বেতা বনের মধ্যে মন্দিরে গিয়ে আর কোন গান করেছিলেন ধ্রুপদ বিনা বা মেঘদূতের যক্ষ রামগিরিতে আর কোন গান করত ধ্রুপদ বিনা! অধ্যাপক মহাশয় ভাষাতত্ত্বে অসাধারণ পণ্ডিত, তাঁর কীর্ত্তি পর্ব্বতপ্রমাণ,—তাঁর কাছে আমরা এ রকমের বিচার ও সিদ্ধান্ত আশা করি না। তাঁর কাছে আমরা চাই সেই শ্রেণীর যাচাই করা মজবুত প্রমাণ যা তিনি তাঁর ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় প্রয়োগ করে থাকেন। ধ্রুপদ style ব্যাপারটা একটু technical, সুতরাং স্নীতিবাবু কেবল নিজের মত প্রচার না করে গান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মত দিলেন না কেন? শুনতে পাই পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীকে ভারতের বিশেষজ্ঞরা দ্বিতীয় তানসেন বলেন; তিনি সারাজীবন এ বিষয়ের চর্চ্চায় অতিবাহিত করেছেন ও গান ও গানের ইতিহাস সম্বন্ধে বহুসংখ্যক পুস্তক রচনা করেছেম। তাঁর মতামত স্নীতিবাবু কেন গ্রহণ করলেন না?

প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি বিষয়ে প্রবন্ধ আছে যা আচার্য্যরায়ের বড় প্রিয়বস্তু ছিল, সে হল "The Hindu College and Reforming Young Bengal"। মনে পড়ে যখন তাঁর ক্লাসে পড়তাম তখন কতবার তিনি অধ্যাপনার বিষয় ছেড়ে এই বিষয়ে বক্তৃতা করে আমাদের তন্ময় করতেন। বিষয়টি সম্বন্ধে এই সুচারু প্রবন্ধ লিখে ডক্টর সুশীল কুমার দে বাংলার বিদ্বৎসমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মধ্যে অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জনের "The Mysteries of Matter" উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধে পদার্থ ও তার গঠন সম্বন্ধে আধুনিক জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে অল্পের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু উচ্ছ্বাসের মুখে প্রিয়দাবাবু লিখেছেন যে 5000 B. C.তে (আর এক স্থানে 3000 B. C.) হিন্দু ও গ্রীক

দার্শনিকরা molecular Theoryর পত্তন করেছিলেন। অধ্যাপক মহাশয় রসায়ন শাস্ত্রে এতই নিমজ্জিত যে ঐতিহাসিক দিন তারিখের সংবাদ নেবার সময় পান নি। এলাহাবাদের অধ্যাপক অমিয় ব্যানার্জ্জীর Modern Science and Influence অতি পরিপাটি রচনা। জৈব বিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটি সুন্দর সুন্দর চিত্র-সম্বলিত প্রবন্ধ রয়েছে, কিন্তু সাধারণোপযোগী করে না লেখায় একটু নিরস লাগে। এর মধ্যে ডক্টর হরেন রায়ের A peep into the microscopic world অপেক্ষাকৃত সুপাঠ্য। সুকুমার বাবুর Time in ancient, medearl and modern chroudlogy খুব মনোজ্ঞ প্রবন্ধ কিন্তু এখানেও ঋগ্বেদকে একেবারে ৩০০০ খ্রীঃ পূঃ তে স্থাপন করা হয়েছে, তিলকের Orionএর পথানুসরণ করে। সুকুমার বাবু কি জানেন না যে তিলকের বেদের কাল নিদ্ধারণকে এখন আর খুব প্রমাণ্য বলে ধরা হয় না? রাধাকমল বাবুর Environment Control of population movement অতি বিচক্ষণ রচনা। পরিশেষে আমি অধ্যাপক সাহার Need for a Hydraulic Laboratory in Bengalএর উল্লেখ করি। বিষয়টি সম্বন্ধে জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সাহা মহাশয় একটি মহোপকার করেছেন; আশাকরি তাঁর প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হবে।

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

What I Owe to Christ—C. F. Andrews (Holder and Stoughton.)

এণ্ড্রুস্ সাহেবের এই বইখানা পড়ে বড় ভালো লাগলো, পূতচরিত্র, ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধুর জীবনকথা বিশেষভাবে তাঁর জীবনে যীশুখৃষ্টের প্রভাব কতখানি, তা সুন্দর সরল ভাষায় লেখা।

ধার্ম্মিক পিতা, ধর্ম্মপ্রাণা কর্ত্তব্যপরায়ণা জননী শৈশবেই তাঁর মনের সম্মুখে যীশুখৃষ্টের অপূর্ব্ব জীবনকে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছিলেন—উপদেশ বা মৌখিক শিক্ষায় ততটা নয়, যতটা নিজেদের জীবন দিয়ে। যীশুখৃষ্ট এণ্ড্রুজের কাছে চিরদিন জীবন্ত—পূর্ণ মহিমায়, প্রেমের ঠাকুররূপে যীশু তাঁর জীবনে প্রতিনিয়ত দেখা দিয়েছেন। সন্দেহের কালিমা, নৈরাশ্যের অন্ধকার এসেছে—মন দিশাহারা হয়েছে—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ক্রাইষ্ট তাঁকে ছাড়েন নি, পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে কত ভাগ রয়েছে—সকলেই এক খৃষ্টকে বিশ্বাস করেন, তথাপি মতের কত বিভিন্নতা। এই সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করে কেমন ভাবে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত-ভূমিতে এসে দাঁড়ালেন—সেই ইতিহাস একদিকে যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনই শিক্ষাপ্রদ। এক এক করে সীমাবদ্ধতা তাঁকে পীড়া দিতে লাগলো, কিন্তু বহু প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে অবশেষে তিনি বিবেকানুমোদিত পথে এসে প'ড়লেন—বৃহত্তর মুক্তির ক্ষেত্রে এসে তাঁর অন্তর তৃপ্তি পেল। আরও বেশী নিবিড় করে তিনি খৃষ্টকে জীবনে উপলব্ধি করলেন—পাশ্চাত্য এবং খ্রীষ্টান জগতের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে একদিকে বিশালতর জগতের সঙ্গে তাঁর যোগ হল, অপর দিকে খৃষ্টের জীবন ও তাঁর বাণীর

গভীরতর মর্ম্ম উপলব্ধি করলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ত্রই মহাপুরুষেরা যে একই সত্য প্রচার করেছেন, ধর্ম্মের মূলভিত্তি যে এক, এই সমন্বয়ে তাঁর মন আনন্দে পূর্ণ হোল।

বইখানির প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত মাতা পিতার বন্দনায় এণ্ড্রুজের জীবনের একটা দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। শৈশবে অনুকূল গৃহ এবং আবহাওয়া মানুষের কতই না দরকার। বইয়ের শেষ কয়টি লাইন পরম উপভোগ্য হয়েছে। পুস্তকখানিতে আমরা আরেকটি জিনিষ দেখতে পাই—সাধুসঙ্গ রূপ সৌভাগ্য এণ্ড্রুজের খুব। বিশপ ওয়েষ্টকট, রেভারেণ্ড ষ্টোক্‌স্, সাধু সুন্দর সিং, প্রোফেসার সুশীল রুদ্র, মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁর জীবনে কখন কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেন, গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত তিনি বর্ণনা করেছেন। রত্নই রত্ন চেনে—এণ্ড্রুজের জীবনসৌরভ এঁদের মোহিত করেছে তাও আমরা জানি। এঁরা, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ, নানাদিকে এণ্ড্রুজের জীবনপথে প্রভাব এবং আলো বিতরণ করেছেন—কিন্তু সকলের মধ্যেই তিনি তাঁর প্রভু যীশুখৃষ্টের প্রকাশ দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন। গান্ধীর কথা একজায়গায় বলেছেন—He is so entirely Hindu, yet so supremely Christian.

এক একটি জায়গায় বড় ভালো লেগেছে—রেভারেণ্ড ষ্টোক্‌স্ যাঁদের সঙ্গে কাজ করতে গেলেন, সম্যক্‌ভাবে তাদেরই একজন হবার জন্য তাদেরই একটি মেয়েকে বিয়ে করে সেখানে সমস্ত জীবন তাদের কাজে বিলিয়ে দেবার সঙ্কল্প করলেন। তাঁর বিবাহ, বিশেষতঃ এই বিবাহ, এখানকার এবং বিলাতের ইংরাজদের মধ্যে অত্যন্ত চাঞ্চল্য জাগায়। বলা বাহুল্য অধিকাংশ লোকেই ষ্টোক্‌সের কাজে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ ও বিস্মিত হলেন—এণ্ড্রুজ কিন্তু তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন।

The Celibate life……can only be regarded as right and justifiable in exceptional circumstaces and for exceptional causes, after all, as Christ himself seems to imply, it is at best a mutilated life on this earth of ours, as nature has framed it, not the normal life of mankind. Then to admit the celibate life to a higher rank than the natural, wholesome married life of man and woman, is to wander astray from Christ and his word.

তাঁদের "Imitation of Jesus" ভেঙ্গে গেল, কিন্তু একদিক্ ভেঙ্গে আরেক দিক্ যে গড়ে তা বেশ সুন্দর ভাবে দেখিয়েছেন।……"Except it die," he said, "it abideth alone, but if it die, it beareth much fruit."। তাঁদের "Imitation of Jesus"—দলটি ভেঙ্গে গেল, কিন্তু তার ফলে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো। বাঁধা-ধরা গণ্ডীর বাইরে গিয়ে দলের অনেকে আপন আপন জীবনকে সুন্দর ভাবে কাজে লাগাতে পেরেছেন—যেমন সাধু সুন্দর সিং। গণ্ডীর ভিতরে হয়তো তেমন ফুটতো না।

এণ্ড্রুজ বিয়ে করেন নি—তাঁর কাজের সঙ্গে স্ত্রী, পুত্র পরিবার নিয়ে স্থির জীবন যাপন করা কষ্টকর—হয়তো এই জন্যই তাঁর মনও ঐদিকে যায় নি। বিয়ে না করলেও তাঁর জীবনে নারীর প্রভাব যথেষ্ট ছিল এবং নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধায় প্রীতিতে তাঁর

মন সরস ছিল। এক জায়গায় লিখেচেন "I have never known the happiness of marriage. This has been denied me and the loss has been undoubtedly great". শৈশবে মায়ের কাছে এবং পরেও বহুস্থানে মেয়েদের সংস্পর্শে এসে তিনি শক্তির উৎসের সন্ধান পেয়েছেন। Without the inspiration of woman's intuitive faith I might have lost my own." (১৩২ পৃঃ)

এই একনিষ্ঠ খৃষ্টান সাধক ও উদার কর্ম্মীর জীবনের স্বচ্ছ সরল ছবিটি পরম উপভোগ্য।

শ্রীস্বর্ণপ্রভা সেন

কথাগুচ্ছ—শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত; এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১৫, কলেজ স্কোয়ার।

বাংলা গল্পের এই প্রথম চয়নিকাকে আমরা বাংলার সাহিত্য-আসরে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করি। ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে এ রকম গল্প-সংগ্রহ বহুপূর্ব্বেই প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে সে সব ভাষা নূতন করে বল ও প্রেরণা লাভ করেছে। বাংলা গল্প-সাহিত্যের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলে তার এমন সম্পদ পরিলক্ষিত হবে যে এতদিন ধরে তার চয়নিকা রচনা ফেলে রাখা অমার্জ্জনীয় বলে গণ্য করা যেতে পারে। অতএব কথাগুচ্ছের সম্পাদক ও প্রকাশক এ অভাবটি দূর করবার ভার নেওয়ায় ধন্যবাদার্হ হয়েছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এর পর নিশ্চয় আবার নূতন কেতায় নূতন বাছাই করে অন্যান্য গল্প-সংগ্রহ প্রকাশিত হবে কিন্তু কথাগুচ্ছ যে এ কাজে অগ্রণী তা চিরদিনই স্বীকৃত হয়ে আসবে।

সম্পাদক মহাশয় লিখেছেন ফরাসীগল্প যেমন ফরাসী দেশের বাংলা গল্পও তেমনি বাংলা দেশের জীবন-স্পন্দন প্রতিবিম্বিত করে। বোধ হয় ছোট গল্পের ধর্ম্মই এই; জীবনের সঙ্গে তার যোগ অতি নিকট ও খুব স্পষ্ট। অন্যদিকে যাকে আমরা বলি উপন্যাস তার যোগ জীবনের সঙ্গে হল একটু কুটুম্বিতার, একটু আড়ম্বরের। কথাগুচ্ছে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একটি ভূমিকা লিখে জগতের সাহিত্যে গল্প-কথার পরিচয় পত্র দান করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন যে গ্রীস রোমের সাহিত্যের কথা যাই হোক, ভারতের সাহিত্যের আদি হল মুখে মুখে রচিত গল্প, আর সে সব গল্প জীবন ও জগৎ থেকে সংগ্রহীত; অর্থাৎ এই সব গল্পের মধ্যে জীবন-স্পন্দন প্রতিবিম্বিত।

কথাগুচ্ছের গল্পগুলি যে ধারায় সজ্জিত হয়েছে তাতে হয়ত বাংলার জীবন-স্পন্দন তেমন করে স্পন্দিত হয় নি; এর কারণও সম্পাদক মহাশয়ের জবানবন্দী থেকে কতকটা ধরা যায়। তিনি জানিয়েছেন যে গল্পগুলি বিশেষ কোন পদ্ধতি অনুসারে সজ্জিত হয় নি, প্রত্যেক লেখকের বৈশিষ্ট্যময় লেখা সংগ্রহ করার চেষ্টা হয়েছে এবং অনেক স্থলে লেখক স্বয়ং গল্প বাছাই করে দিয়েছেন। আগুপিছু করে সাজানোর একটা ধারা আছে; তাতে রবীন্দ্রনাথের দুটি গল্প "অপরিচিতা" ও 'ক্ষুধিত পাষাণ' আছে সব শেষে, গোড়ার দিকে রয়েছে লোকান্তরিত লেখকদের গল্প, তার প্রথমেই শোভা পাচ্ছে প্রভাতবাবুর "আদরিণী"

ও "ফুলের মূল্য"। মধ্যবর্ত্তী স্থান দখল করে আছে প্রমথবাবু, শরৎচন্দ্র থেকে সুরু করে আধুনিক লেখক লেখিকা—বিভূতিবাবু, মনীন্দ্রলাল, শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র-মিত্র, মনোজবসু, সীতাদেবী, শান্তাদেবী—প্রভৃতিদের গল্প,—কতকটা লেখকদের আবির্ভাব অনুসারে পর পর সাজান। মোট গল্প সংখ্যা ছত্রিশটি।

যে ছুটি কথা উঠেছে অর্থাৎ জীবনস্পন্দনের প্রতিবিম্ব ও লেখকদের আপন আপন বৈশিষ্ট্য সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যে প্রথমটি যেমন সর্ব্বত্র ফুটে ওঠেনি দ্বিতীয়টি সম্বন্ধেও তেমনি সর্ব্বত্র নিঃসন্দিহান হওয়া যায় না। গল্পের নির্ব্বাচন সর্ব্বত্র লেখকের বৈশিষ্ট্য ফোটাবার উপযোগী হয় নি। রবীন্দ্রনাথের "অপরিচিতা' তাঁর গল্পগুলির ভেতর থেকে যে খুব ভাল বাছাই তা বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় ছাড়া আর কেউই স্বীকার করবে না। শরৎচন্দ্রের 'মন্দির' তার কাঁচা হাতের ছাপ লুকাতে পারে না; এটি তাঁর প্রথম গল্প বলে দেওয়া হয়েছে না তাঁর বৈশিষ্ট্য বিকাশের জন্য দেওয়া হয়েছে তা ভাল বোঝা যায় না। তেমনি 'অভাগীর সর্গে'র যদি কিছু দাবী থাকে ত সে ছোট বলে, নতুবা নিশ্চয়ই শরৎ-বাবুর অনেক গল্প আছে যা তাঁর প্রতিভা প্রকৃষ্টতর রূপে ব্যক্ত করে। কেদারবাবুর নন্দোৎসব সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা; এর চেয়ে তাঁর ঢের ভাল গল্প রয়েছে। মনিলাল, জলধরবাবু প্রভৃতি অনেকের সম্বন্ধেই আমার বক্তব্য এই একই। অপর পক্ষে প্রভাতবাবু, রবীন্দ্রমৈত্র ও আধুনিক উদীয়মান লেখকদের গল্পের বাছাই যথোপযোগী হয়েছে। আধুনিক লেখকদের গল্পের মধ্যে একটা মুস্কিল আছে, তাঁদের অনেকেরই লেখার ধাতই এখনও দানা বেঁধে স্থায়িত্ব লাভ করেনি, নতুবা যে কলমথেকে অচিন্ত্যকুমারের 'রুদ্রের আবির্ভাব' বার হয়েছে তা থেকে যে কেমন করে গোছা গোছা নিকৃষ্ট লেখা বার হচ্ছে এর্ আমি কোন মীমাংসা করতে পারিনে।

পূর্ব্ববর্ত্তী ও আধুনিক লেখকদের যে ধারাবাহিকতায় কথাগুচ্ছের গল্পগুলি সজ্জিত তা থেকে বাংলাগল্পের একটা প্রগতি বিকাশ পাচ্ছে। অন্ততঃ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে প্রভাতবাবু ও শরৎচন্দ্র ছাড়া কোন পূর্ব্ববর্ত্তী গল্প-লেখকই প্রেমেন্দ্রমিত্র শৈল-জানন্দ প্রভৃতি আধুনিক গল্পলেখকদের রচনার উচ্চস্তরে পৌছাতে পারেন নি। জীবন-স্পন্দনের প্রতিবিম্বই হক আর আপন নির্ব্বিকল্প সৃষ্টিই হক গল্পের স্বরূপ এদের কাছে যেমন সত্য ভাবে ধরা পড়েছে তেমন ভাবে এদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের কাছে ধরা পড়েনি। বাস্তবিক এই পূর্ব্ববর্ত্তীদের লেখা গল্প পড়লে এটা না মনে হয়ে যায় না যে তাঁরা গল্প না লিখে গল্প লেখার "শ্রীচরণকমলেষু" পাঠ মক্স করে এসেছেন মাত্র। চৌধুরী মহাশয় ভূমিকায় বাংলাগল্পের সূত্রপাত সম্পর্কে বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথ থেকে বাঙ্গলা গল্প স্ফুরিত হয়েছে। অনুমান করা যেতে পারে,—যে কারণেই হক,—রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আধুনিক লেখকদের ওপর যে রকম পূর্ণভাবে বর্ষিত হয়েছে, এদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের ওপর তেমন ভাবে হয়নি। আর একদিকে,—রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সবুজপত্র, বলাকা যুগের সময় থেকেই পূর্ণ স্বরূপ ও শক্তি লাভ করেছে। এখন নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের ভরা জোয়ার আর আধুনিক লেখকদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের মধ্যে এক প্রভাতবাবু ও চৌধুরী মহাশয় ছাড়া এমন কেউই ছিলেন না যিনি আপন মৌলিকত্বের ওপর ভর দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতেন।

আধুনিক লেখকদের সম্বন্ধে আর একটি কথা বলবার আছে। এদের কেউ কেউ sex story ও বস্তির গল্প বলবার দুর্জ্জয় সাহসিকতা দেখিয়েছেন কিন্তু গুচ্ছকথা থেকে

এশ্রেণীর গল্প সযত্নে বাদ দেওয়া হয়েছে! এটা এখন সুবিদিত যে sex জীবন-স্পন্দনের একটা প্রধান উৎস; কই sex কাব্যে আরাধনা করতে ত বাধে না, বিদেশী ভাষায় লেখা গল্পে ও সিনেমায় উপভোগ করতে বাধে না? বাংলাগল্পের চয়নিকাতে এ শ্রেণীর গল্প বাদ দিলে কি জীবন প্রতিবিম্ব ক্ষুণ্ণ হবে না? তবে যদি সম্পাদক মহাশয় এমন sex story না খুঁজে পেয়ে থাকেন যার কোন সাহিত্যিক দাবী আছে তবে সে আলাদা কথা। সম্পাদক মহাশয় বুদ্ধদেব বাবুর কোন গল্পকেও এই গল্প সংগ্রহে স্থান দেন নি, এ পক্ষপাত্বিতের ও কোন কারণ অনুমান করা যায় না; আমার মনে হয় এতে গুচ্ছকথা নিজেই বঞ্চিত হয়েছে। অথবা বুদ্ধদেব বাবু আজকাল লেখায় যে রকম শৈথিল্য আনয়ন করেছেন তাতে সম্পাদক মহাশয়ের নির্ব্বাচন পদ্ধতির একটা সাফাই থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে আরও অনেক গল্পলেখক রয়েছেন যাঁদের বাদ দিয়ে সম্পাদক মহাশয় গুচ্ছকথাকে বঞ্চিত করেছেন; অথচ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা একপৃষ্ঠার জঘন্য বাজে গল্প কেন দেওয়া হয়েছে তাও বোঝা শক্ত।

একদিন হয়ত বাংলা গল্পের চয়ণিকা ইংরাজীতে অনুদিত হবে। আমার মনে হয় সে দিন অচিন্তবাবু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ প্রভৃতির গল্প বিশ্বের সাহিত্য আসরে আপন ঠাঁই করে নিতে পারবে। প্রভাতবাবু, চৌধুরী মহাশয়ের গল্প সম্বন্ধে ত কোন কথাই নাই। "আদরিণী", "কুলের মূল্য"' 'রুদ্রের আবির্ভাব', 'পুঁইমাচা', 'অসমাপ্ত, 'মোট বারো' বিশ্বের সাহিত্যে একেবারে নগণ্য হবে না।

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

Nationalism in the Soviet union—Hans Kohn ,—George Routledge & Sons.

"বিশ্বের বিত্তহীন সম্প্রদায় একীভূত হও" এই বাণী ঘোষণা করা যে রাষ্ট্রের ব্রত, সেই রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদের কোনস্থান আছে কিনা জানিবার জন্য কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। কলেজে যে সকল বই পড়াইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয় তাহাতে লেখা আছে যে সোভিয়েট রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী—কেননা রাশিয়ার বিশাল প্রাচ্য সাম্রাজ্য এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। মনে খট্‌কা বাধিত যে যে বলশেভিকগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সাম্রাজ্য-বাদীদের মনে বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে, তাহারা নিজে কেমন করিয়া সাম্রাজ্য শাসন করে? এতদিন এই সমস্যা-সমাধানের কোন সূত্র পাই নাই কেননা রাশিয়া সম্বন্ধে যে সকল বই সচরাচর হাতে পড়ে তাহাতে সোভিয়েটের অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দোষ ত্রুটী বা প্রশংসার কথাই দেখা যায়—পুরাতন রুশসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রাচ্যজাতিগুলির বর্ত্তমান অবস্থার বর্ণনা বিশেষ পাওয়া যায় না। সুপ্রসিদ্ধ রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ ডাঃ হান্স কোন্ আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া কেবল যে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিয়াছেন তাহা নহে, পরন্তু বিংশশতাব্দীর রাষ্ট্রীয় প্রগতির একটি বিশিষ্ট ধারার সন্ধান দিয়াছেন। ডাঃ হান্স কোন্ প্রাচ্যে জাতীয়তাবোধের বিকাশ সম্বন্ধে "A History of

Nationalism in the east" ও Nationalism and Imperialism in the Hither East" নামক দুইখানি মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়া সুধী সমাজে যশোভাজন হইয়াছেন। রাশিয়া সম্বন্ধেও ইহা তাঁহার প্রথম গ্রন্থ নহে—১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "বিপ্লবের অর্থ ও নিয়তি" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তিনি রাশিয়ায় যাইয়া সোভিয়েট যুক্ত রাষ্ট্রে জাতীয়তাবোধের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন ও সেই অনুসন্ধানের ফল এই গ্রন্থে তিনি পাঠকবৃন্দকে উপহার দিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে রাশিয়ার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে ওকালতী করিবার কোন নিদর্শন নাই—আছে শুধু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় ক্রমবিকাশের ধারা নির্দ্দেশের প্রচেষ্টা।

বর্ত্তমান সময়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৫টি বিভিন্ন জাতি বাস করে—১৪৭টি ভাষা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। এই জাতিগুলির মধ্যে সংখ্যানুসারে ৫টি প্রধান। ১৫কোটি ৮৪ লক্ষ লোকের মধ্যে শতকরা রাশিয়ান ৫৩·০৫ জন, উক্রানিয়ান ২১·২৭ জন, হোয়াইট্ রাশিয়ান্ ৩·২৩জন, কাজাক ২·৭১জন উজবেক ২·৬৬জন। অন্যান্য জাতির লোকসংখ্যা শতকরা দুইজনেরও কম। ১৮৫টি জাতির মধ্যে কয়েকটি মাত্র বিপ্লবের পূর্ব্বে সভ্যতার দাবী করিতে পারিত। অন্যান্যগুলি রাশিয়ান্ সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষণে সভ্যতার আলোক লাভে বঞ্চিত ছিল। সোভিয়েট যুক্ত রাষ্ট্রের অনুন্নত লোকসংখ্যাকে উৎপত্তি ও ভাষার বিভিন্নতা হিসাবে চারিটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ ফিনিশ—উগ্রিয়ান জাতিসমূহ (races)! ইহারা মধ্য ও উত্তরপূর্ব্ব রাশিয়ার জলা ও জঙ্গলময় ভূমিতে বাস করে। এই বিভাগের অন্তর্গত কোমি, মারি, মোউভিন প্রভৃতি জাতি ক্রমান্বয়ে রাশিয়ানগণের দ্বারা উর্ব্বরভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া নিতান্ত নিঃস্ব ও বর্ব্বর অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছিল। দ্বিতীয়তঃ তুর্কোতাতার জাতি সমূহ। ইহাদের মধ্যে ভোল্গা ও ক্রিমিয়ার তাতারগণ ও চুভাশ (Tschuvash) জাতি কিয়ৎ পরিমাণে সভ্য হইয়াছিল—কিন্তু এই বিভাগের বাশকির, কাজাক, কিরঘিজ প্রভৃতি শাখা নিরন্ন ও জ্ঞানহীন ভাবে জীবন যাপন করিতেছিল। মধ্য এশিয়ার উজবেকগণ সামন্ততন্ত্রমূলক সভ্যতার অধিকারী ছিল ও প্যান-ইস্লামের সমর্থন করিত। কিন্তু তাহাদের পশ্চিম প্রান্তের প্রতিবেশী যযাবর তুর্কোমানগণ—সভ্যতার কোন ধার ধারিত না। দক্ষিণ ককাশাসের আজারবৈজানের তুর্কগণ আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে অনুপ্রাণিত ছিল। তৃতীয়তঃ ককেশিয়ান্ জাতিসমূহের মধ্যে জর্জ্জিয়ান্ ও আর্ম্মেনিয়ানগণ অনেকদিন হইতেই জাতীয়তাবাদের উপাসক ছিল। চতুর্থতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মোঙ্গলগণও হীন অবস্থায় বসবাস করিতেছিল।

জারের শাসিত রাশিয়ান্ সাম্রাজ্যে সর্ব্ব প্রথম ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা ও জাতীয় ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের বাণী ঘোষিত হয়। যদিও ঐ সময়ে অধীন জাতিগুলি কোন রাষ্ট্রীয় অধিকার পায় নাই, তথাপি তাহাদের মধ্যে জীবনের চাঞ্চল্য অনুভূত হইয়াছিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের নব্যতুর্ক বিদ্রোহের ফলে রাশিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মুসলমান জনসমূহের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রভাব বিস্তার লাভ করিতে থাকে। সেই সময়ে জারের শাসনযন্ত্র অধীন জাতিসমূহের উপর রাশিয়ান সভ্যতার বোঝা চাপাইয়া দিবার অশেষবিধ চেষ্টা করিতেছিল। শাসন ও বিচার কার্য্যে, বিদ্যালয়ে ও সভাসমিতিতে রাশিয়ান ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করিতে দেওয়া হইত না। এমন কি হোয়াইট রাশিয়ান ও

উক্রানিয়ান ভাষায় গ্রন্থ ও সংবাদ পত্র প্রকাশ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইত। সকল প্রকার লাভজনক রাজকার্য্যে রাশিয়ানগণ নিযুক্ত হইত—অধীন জাতিদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছা করিত তবে তাহাকে রাশিয়ায় আসিতে হইত। অধীন জাতিরা সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় অধিকার (civil rights) হইতে বঞ্চিত ছিল। এই প্রকার ব্যবহারের ফলে তাহাদের মনে রাশিয়ার কবল হইতে মুক্ত হইবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল। মহাযুদ্ধের সময়ে জাতীয় ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের (National self-determination) বাণী শুনিতে শুনিতে তাহারা নিজের নিজের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের বিপ্লবের পর দেখা গেল যে রাশিয়া তাহার পশ্চিমের সাম্রাজ্য—যাহার মধ্যে ফিনল্যাণ্ড, এস্থোনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুনিয়া ও পোল্যাণ্ড ছিল—ছাড়িয়া দিতে তো বাধ্য হইয়াছেই—উক্রানিয়া, আজারবৈজান, জর্জ্জিয়া ও আর্ম্মেনিয়াতেও স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এমন কি সাইবেরিয়াতেও বলশেভিক বিরোধীদলের নেতৃত্বে নূতন রাষ্ট্র সংগঠিত হইতেছে।

এই অবস্থায় বলশেভিকগণ পোল্যাণ্ড ও ব্যাল্টিক সাগরের উপকূলের রাষ্ট্রসমূহের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া লইলেন। ঐ সকল স্থানে পাশ্চাত্যভাব ও ধনিকতন্ত্রবাদের এতদূর প্রসার হইয়াছিল যে সোভিয়েটের শাসন মধ্যে উহাদিগকে ফিরাইয়া আনিলে অনর্থক গৃহবিবাদ বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু অন্যান্য জাতিসমূহের মধ্যে বলশেভিকগণ জোরের সহিত প্রচারকার্য্য ও ষড়যন্ত্র চালাইতে লাগিলেন। ফলে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আজারবৈজান, আর্ম্মেনিয়া ও জর্জ্জিয়াতে স্বতন্ত্র সোভিয়েট রাষ্ট্র স্থাপিত হইল। ইতিমধ্যে বলশেভিক সৈন্যদল বৈকাল সরোবরের পশ্চিম তীরবর্ত্তী স্থান সমূহ ও ওম্স্ক, টোম্স্ক, ইর্কুট্স্ক প্রভৃতি স্থান পুনরায় অধিকার করিয়া লইল। তৎপরে কম্যুনিষ্ট দলের সাধারণ সম্পাদক ষ্টালিন সোভিয়েট তন্ত্রাবলম্বী সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণের মহাসভায় একতার সুবিধা ব্যাখ্যা করিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে অন্যান্য সোভিয়েট রাষ্ট্রের সহিত রাশিয়ার সোভিয়েট রাষ্ট্রের সন্ধি হইল। ১৯২৩ হইতে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে (1) the Russian Socialist Federated Soviet Republic, (2) the Ukranian Socialist Soviet Republic (3) the Transcaucasian Socialist Federated Soviet Republic (4) the Whip Russian Socialist Soviet Republic (5) the Uzbekistan Socialist Soviet Republic (6) the Turkmenistan Socialist Soviet Republic এবং (7) the Tadrikistan Socialist Soviet Republic প্রধানতঃ এই সাতটি যুক্তরাষ্ট্র লইয়া Union of Socialist Soviet Republics (U.S.S.R.) গঠিত হয়। U.S.S.R.এর মধ্যে ৪২টি স্বতন্ত্র খণ্ড আছে। তন্মধ্যে ৯টি যুক্তরাষ্ট্র federal member states) ১৫টি স্বতন্ত্র গণতান্ত্রিকদেশ (autonomous republics) ও ১৮টী স্বতন্ত্র জনপদ (autonomous regions)।

এই বিশাল রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে প্রত্যেকজাতি কি নীতির ফলে একইকালে জাতীয়তা-বাদের ও কম্যুনিষ্ঠবাদের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইতেছে তাহাই বর্ণনা করা ডাঃ হান্স কোনের উদ্দেশ্য। তিনি দেখাইয়াছেন যে বলশেভিক বিপ্লবের বহুপূর্ব্ব হইতেই লেনিন রাশিয়ার অধীন জাতিদের সমস্যা আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন।

লেনিন অবশ্য পরস্পর যুধ্যমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে মানব সমাজকে বিভক্ত দেখিতে চাহিতেন না। তিনি চাহিয়াছিলেন বিভিন্ন জাতির লোকের অবাধ মিলনের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত বৃহত্তম অর্থনৈতিক সঙ্ঘ। কিন্তু এরূপ সঙ্ঘ স্থাপন করিতে হইলে পরস্পরের মধ্যে সাম্যের প্রয়োজন। যদি এক জাতি অপর জাতির উপর সামান্য অত্যাচারও করে, যদি কোন ভাষা বা জাতিকে সামান্য প্রাধান্যও দেওয়া হয়, যদি কোন জাতিবিশেষের হাতে রাষ্ট্রের পরিচালনার ভার দেওয়া হয়, তাহা হইলে জাতীয়তা-বাদের হলাহল সমগ্র সমাজদেহে প্রবিষ্ট হইয়া সঙ্ঘকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে—বিভিন্ন জাতির শ্রমিকের সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃ-সঙ্ঘ কল্পনার কুহেলিকায় মিলাইয়া যাইবে। সুতরাং সমস্ত জাতিকে সমান অধিকার দিয়া, সমান অবস্থায় উন্নয়ন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উন্নততর জাতীয় সাম্যে উপনীত হইলে বিভিন্ন জাতির বিত্তহীনদের মধ্যে আন্তর্জাতীয়তার ভাব বৃদ্ধি পাইবে। লেনিন এরূপ নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন যাহার ফলে জাতীয় ভাব বৃদ্ধি পাইয়া উহা আন্তর্জাতিক ভাবে অন্তর্লীন হইতে পারে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ষ্ট্যালিন "Martism and the National question" নামক যে পুস্তিকা লেখেন তাহাতে লেনিনের উক্ত মতের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় :—

"At this difficult moment a high mission falls upon the Social Democracy—to take up its position against nationalism, to keep the masses out of the general current. The Social Democracy and it alone can do this, by opposing to nationalism the proven weapon of internationalism, the unity and indivisibility of the class struggle. The higher the wave of nationalism rises, the more loudly must the voice of the Social Democracy be raised for the fraternity and unity of the proletarians of all nationalities of Russia..........

This is why the workers are fighting and will fight against every policy of national oppression in all its forms, from the subtlest to the crudest. This is why the Social Democracy of all countries is proclaiming the right of the peoples to self-determination."

বিপ্লবের চারিবৎসর পূর্ব্বে যে নীতি স্থিরীকৃত হইয়াছিল ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে U. S. S. R. স্থাপিত হইবার পর তাহাই অনুসৃত হয়। এই নীতি অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক জাতির স্বনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা স্বীকার করা হইয়াছে—এমন কি যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিবার স্বাধীনতা পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক জাতিকে সমান অধিকার দিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শাসন-সমিতিকে (The Union Central Execution Committee) দুই কক্ষে (Chambers) বিভক্ত করা হইয়াছে—প্রথমতঃ Soviet of the Union নামক কক্ষ—প্রত্যেক সাধারণতন্ত্র হইতে জন সংখ্যার অনুপাত অনুসারে প্রায় চারিশত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ Soviet of Nationalities নামক কক্ষে প্রত্যেক জাতি হইতে সমান সংখ্যক

প্রতিনিধি (প্রায় ১৩০ জন) লওয়া হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক জাতির আভ্যন্তরীণ শাসনভারও রাশিয়ানদের হাতে না রাখিয়া জাতির উপযুক্ত ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

যেরূপ রাজনৈতিক বিষয়ে সেইরূপ ভাষাও শিক্ষা বিষয়ে প্রত্যেক জাতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক জাতি শিক্ষা ও শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে নিজের নিজের মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে পারে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র উক্ত ক্ষমতা দিয়াই নিশ্চিন্ত হয় নাই, পরন্তু প্রত্যেক জাতির ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য অশেষ বিধ চেষ্টা করিতেছে। এমন অনেক জাতি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ছিল যাহাদের সাহিত্য দূরে থাকুক অক্ষর পর্য্যন্ত ছিল না। তাহাদের মধ্যে ল্যাটিন অক্ষর প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে; তাহাদের পাঠ্যপুস্তক লেখান হইয়াছে; তাহাদের স্বজাতীয় শিক্ষককে শিক্ষা দিয়া উপযুক্ত করা হইয়াছে। যাহাদের মধ্যে সাহিত্য ছিল অথচ সাহিত্য মধ্যযুগীয় ধর্ম্মভাব প্রণোদিত ছিল ও সাধুভাষায় রচিত হইয়াছিল তাহাদের সাহিত্যকে নবভাবধারায় অনুপ্রাণিত করিয়া সাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে। ডাঃ হান্সকোন্ গ্রন্থের পরিশিষ্টে কোন ভাষায় কতগুলি বই কতখানি করিয়া সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ছাপিয়াছে তাহার তালিকা দিয়াছেন। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসের আলোচনায় উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। প্রত্যেক জাতির নৃত্য গীত, কবিতা, কারু ও চারু শিল্প যাহাতে পুনরায় প্রচলিত হয় ও সমৃদ্ধিলাভ করে তাহার জন্য সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট অশেষবিধ চেষ্টা করিতেছে।

কিন্তু জাতীয়ভাবের পরিপোষক রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যও ভাষা শিল্প প্রভৃতি সভ্যতার বহিরঙ্গ রূপকে উৎসাহ দিলেও সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট জাতির সভ্যতার অন্তরঙ্গরূপ বা সাধনাকে (culture) হত্যা করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছে। এ বিষয়ে তাহাদের মন্ত্র "Death to the national culture"। সকল জাতির সকল লোককে একভাবে অনু-প্রাণিত করিতে না পারিলে কম্যুনিজিমের আন্তর্জাতিক রূপ ব্যর্থ হইয়া যাইবে আশঙ্কায় এই নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রত্যেক জাতির নিজের নিজের ভাষায় গ্রন্থাদি রচিত হইতেছে বটে, কিন্তু প্রত্যেক পুস্তকে কম্যুনিজিমের মূলনীতি প্রচার করা হইতেছে। আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠানগুলিকেও কম্যুনিজিম প্রচারের বাহন করা হইয়াছে। অর্থ-নীতিতে প্রত্যেক সাধারণতন্ত্রকে কম্যুনিষ্ট করা হইয়াছে ও প্রত্যেক জাতির উৎপাদন প্রণালীকে কারখানার আদর্শে পরিবর্ত্তিত করা হইতেছে। সামাজিক ব্যাপারেও প্রত্যেক জাতির আচার ব্যবহারকে রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট আদর্শে সংস্কৃত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। এই চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে তাহা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী জাতিগুলির অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে। তাতার বালিকারা এখন সরকারী বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইতেছে। মধ্য এশিয়ায় মুসলমান নারীদের শিক্ষার জন্য যাযাবর-পাঠাগার, ধাত্রী, চিকিৎসক প্রভৃতি প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করা হইয়াছে। সম্প্রতি প্রাচ্য সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রগুলির মধ্যে ১৫০০ জন নারী গ্রাম্য সোভিয়েটের সভাপতি হইয়াছে। উজবেকিস্তানে ১৮ জন নারী নেতৃপদ পাইয়াছে, একজন তথাকার কেন্দ্রীয় শাসন-সমিতির সভ্য হইয়াছে। কাজাকিস্তানের প্রধান বিচারালয়ে একজন নারী প্রধান বিচারপতি হইয়াছে। মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে নারীর পক্ষে এই সকল পদ পাওয়া যে কিরূপ কষ্টকর তাহা আর আমাদের দেশের

লোককে বুঝাইতে হইবে না। কম্যুনিষ্টদের অসাধারণ প্রচারকার্য্যের ফলেই গত ছয় বৎসরের মধ্যে মুসলমান সমাজে এই অসম্ভব পরিবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছে।

একদিকে জাতীয়তাবাদের পোষণ অন্যদিকে উহার নিষ্পেষণ বর্ত্তমান সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে চলিতেছে। ইহার মধ্যে কোন নীতি অধিকতর কার্য্যকরী হইবে সে কথা বলা কঠিন। হান্সকোন্ বলেন কম্যুনিষ্টদের সাধারণ সাফল্যের উপর জাতীয়তার সহিত আন্তর্জাতীয়তার মিলন প্রচেষ্টার কৃতকার্য্যতা নির্ভর করিতেছে। এই প্রসঙ্গে আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে দুইটি নজির দাখিল করিতে চাই। রাশিয়ান্ কম্যুনিষ্টদের মতন আর্য্যগণও তাঁহাদের সাধনাধারা ভারতের অন্যান্য জাতির মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন অথচ অন্যান্য জাতির ভাষা ধর্ম্ম ও সভ্যতার বহিরঙ্গ রূপের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু সাধনগত ঐক্য (যাহাকে ডাঃ রাধাকুমুদ Fundamental Unity বলিয়াছেন) ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য আনিতে পারে নাই—বিভিন্ন প্রদেশের লোকের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। আবার ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আসিয়া ভারতের সমস্ত প্রদেশ এক শিক্ষা, এক সভ্যতা, এক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার ফলে সমগ্র ভারতের মধ্যে জাতীয় বোধ উদ্বুদ্ধ হইলেও এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের বিরোধ বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। সাধনাগত ও অবস্থাগত ঐক্য ভাষাও দেশগত অনৈক্যকে পরাভূত করিতে পারে এরূপ প্রমাণ আমরা অন্ততঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে পাই না।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার